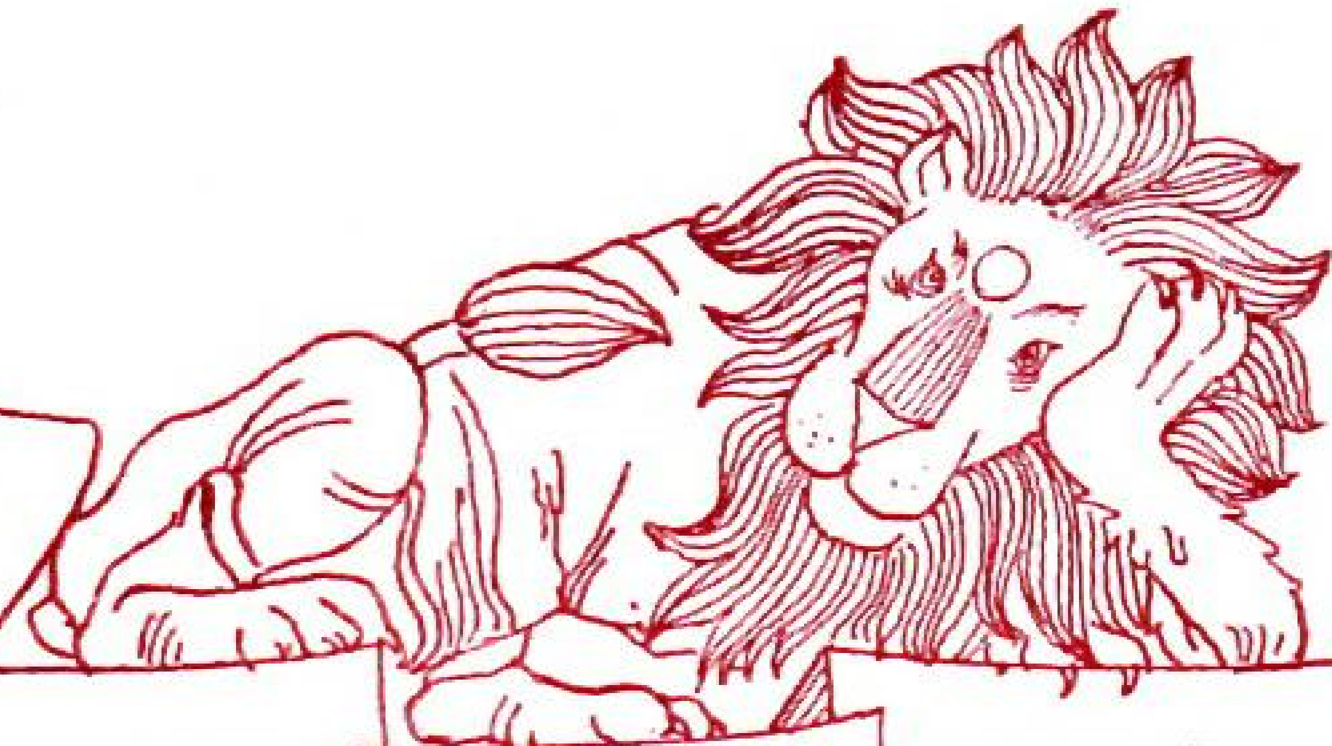
# চৈতন চুটকি



অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর



निर्मल



# চৈতন চুটকি



অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক এজেন্সী

প্রকাশক : নির্মল কুমার সাহা
নির্মল বুক এজেন্সী
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রাকর : হীরালাল দাস
তারা প্রেস
১০০ অরবিন্দ সরণী কলিকাতা-৭০০০০৬

মলাটের ছবি : বিমল দাস

ভেতরের ছবি : অরুণ চক্রবর্তী

দাম : পাঁচ টাকা

# চৈতন চুটকি



বাস্তুভিটে যাকে বলি। সে কী আশ্চর্য কারখানা! পাখির ডিমের উপরের খোলার মতো পাতলা, হাজার হাজার বছরের পুরোনো চিনেমাটির তার দেওয়াল,—এমন হালকা এমন ঠুন্‌কো হয়ে গেছে যে, শব্দের রেশ, বাতাসের পরশ পেলে কাঁপতে থাকে,—মনে হয় এখনি বুঝি ফেটে চৌচির হল। এই ঠুন্‌কো পাতলা চিনেমাটির আশ্চর্য বাড়ি পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়। এর মধ্যে হুজুরের চাকর-বাকর যারা কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছে তারা আস্তে উঠছে, আস্তে বসছে, আস্তে চলছে, আস্তে বলছে—হুজুরের ভয়ে যত না হোক, পাছে কিছু তারা ভাঙে, পাছে তাদের সেই পুরোনো ঠুন্‌কো দেওয়ালের কোথাও আঁচড় লাগে সেই ভয়েই তারা সর্বদা সাবধানে আছে। শুনেছি এক সময় একজন নতুন চাকর অসাবধানে হঠাৎ চীনের পুতুলের একটু চটা উঠিয়ে ফেলেছিল। যখন তার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালবার হুকুম হল তখন সে বললে—'অপমানের জন্যে দুঃখু করিনে; অমন পুতুলটি খণ্ডিত হয়ে গেল আমারই হাতে!' প্রাণের চেয়ে পুতুলই ছিল তাদের বড়।

এই বাড়ির বাগান—আরো আশ্চর্য! কত বড় যে সে বাগানখানা তা সে বাগানের সদ্দার-মালীও বলতে পারে না। কুঞ্জবন সে গিয়ে মিলেছে মহাবনে, মহাবন সে মহাসমুদ্রের ভিতর পর্যন্ত নেমে গেছে— ছাওয়ার মত হয়ে। এখানে এক-একটি যত্নের গাছে যখন ফুল

ধরে, ফল ফলে, তখন তাদের বোঁটায় মালীরা সোনার আর রুপোর ঘুঙুর বেঁধে দেয়; বাতাসে সেগুলি বাজতে থাকে, তবে জানা যায় বাগানে অমুক দিকে ফুল ফুটেছে, অমুক দিকে ফল ফলেছে—এত বড় সে বাগান, এমন চমৎকার এমন সৌখিন বাগান।

এই বাগানের একটি দিক—সেদিকের খবর না-জানেন হুজুর, না-জানে তাঁর মালী; কেবল জানে দেশের যত লক্ষ্মীছাড়া আর তাদের রানী—সে একটি কচি মেয়ে—নীচ জাত। কেউ তাদের চায় না, তাই কেউ যেদিকে যায় না সেইদিকে তারা একলা আছে—একটি প্রকাণ্ড কল্পতরু হেলে পড়ে সমুদ্রের নীল জলের উপরে ছাওয়া দিয়েছে—তারই তলায়। ছোট জাত, কাজেই—রাজবাড়ির সাত তলার একটি তলাতেও তাদের জন্যে জায়গা নেই। দেশের লোকের পায়ের ধুলো-কাদা ধুয়ে নেবার জন্যে রাজার দেউড়িতে দুবেলা হাজির থাকবার হুকুমটাও না; যদিও দেশসুদ্ধ সবাইকে তারাই কিন্তু বরাবর বছরে বছরে নিয়মিত বাগানের খাঁটি পদ্মমধু যুগিয়ে আসছে।

এই যে কল্পতরু যার পাতা কখনো খসে না, ফুল কখনো ঝরে না, এরই উপরে একটি পাখি। সে যে কী পাখি, কেমন পাখি, তা তো বলা যায় না—কিন্তু তার গান—সে যে স্বর্গের কিন্নরীদের গানের চেয়ে মিষ্টি। সমুদ্রের এপারে গাইছে সে পাখি, সমুদ্রের ওপার পর্যন্ত তার সুর গিয়ে ঠেকছে—চাঁদনী রাতের আলোর মতো বাতাসের ঢেউয়ের উপর দিয়ে। মাঝি মাঝ-সমুদ্রে জাহাজ থামিয়ে সে গান শুনে গেল, ওপারের লোক সমুদ্রের ধারে দিনের পর দিন কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে সে গান শুনে মশগুল হয়ে রইল, আর সে গানের কত তারিফ করে তারা বই লিখলে, বর্ণনা দিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিলে সেই চমৎকার আশ্চর্য পাখির কথা; অথচ সেই ছোট মেয়েটি আর তার দলের লোক ছাড়া বাগানের মালিক যিনি তিনিও জানেন না, বাগানের মালী যারা তারাও জানে না, হুজুরের সভাসদ পারিষদ লোক-লস্কর পরিবার প্রজা কেউ জানে না এই আশ্চর্য পাখির খবর—যার গানের কাছে সেই চমৎকার বাড়িখানা, সেই অদ্ভুত বাড়িখানা, সেই অদ্ভুত বাগানটিও কিছুই নয়।

চট দিয়ে মোড়া গালামোহর-করা একরাশ বই আজ অনেকদিন হল বিদেশ থেকে হুজুরের তাকিয়ার কাছেই পড়ে আছে—সময় নেই যে তিনি সেগুলো খুলে দেখেন। সেদিন বেলা দুপুরে একটা মশা হঠাৎ কানের কাছে হুল ফুটিয়ে হুজুরের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। তাঁর হাতে কোন কাজ নেই অথচ মশাটা বারে বারে ঘুমও ছুটিয়ে দিচ্ছে। হুজুর হাতের কাছের সেই চট-মোড়া বইগুলো একে একে খুলে দেখতে লাগলেন। বইগুলো তাঁর ঠুন্‌কো বাড়ির কারখানা,

অদ্ভুত বাগানের বর্ণনায় ভরা। এর মধ্যে একখানা বই—তার মলাটের ছবিটায় তাঁর চোখ পড়ল—সোনার একটি ফুলের ডালে পাখি গাইছে। হুজুর সেই বইখানা খুলে পড়তে লাগলেন—'হুজুরের আশ্চর্য পাখির গান।' যিনি প্রকাশক তিনি বিদেশের একজন বিখ্যাত



ওস্তাদ। বইখানা পড়তে পড়তে নাকের উপরে কচ্ছপের খোলা দিয়ে বাঁধানো মোতিয়াবিন্দু চশমার বড় বড় গোল দু'খানা পরকলার ভিতর দিয়ে হুজুরের দুই চোখ বিস্ময়ে ক্রমে বড় হয়ে উঠছে বেশ দেখা গেল। বাড়ির প্রধান কর্মচারী যিনি কাজের খবরের চেয়ে হুজুরের মেজাজ কখন কেমন তারই খবর ভালো করে রাখেন, তিনি আজ পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখছিলেন। কর্তার চোখ যতই খুলতে দেখা গেল—কর্মচারীর দম ততই বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। আজ কর্তা অনেকটা চোখ খুলেছেন; না জানি আজ কপালে কী আছে—এই ভাবতে ভাবতে তত্ত্বাবধানিক যখন তিনশো-তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম জপছিলেন এবং দশ আঙুলে কচ্ছপ-মুদ্রা

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কর্তার নাকের উপরে কচ্ছপের খোলায় বাঁধানো চশমাটিকে শাপ দিচ্ছিলেন যেন ওর কাঁচ দু'খানা এখনই গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়—এমন সময় সত্যিই চশমাখানা খুলে কর্তা ডাক দিলেন—'কোই হ্যায় !' কচ্ছপ-মুদ্রা দেখাতেই হুজুরের চশমা চোখের উপর থেকে সরে গেল, কর্মচারী নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। তিনশো-তেত্রিশ কোটিকে একে-একে প্রণাম করবার তাঁর সময় হল না, তিনি দরজার চৌকাটে তিনবার মাথা ঠুকেই খালি পায়ে কর্তার সামনে উপস্থিত হলেন। তখন কর্তার চোখ আবার বারো-আনা বন্ধ হয়ে এসেছিল। তিনি বললেন—'এই বইখানাতে আমার এ বাগানের একটি পাখির কথা লিখছে, বলছে—আমাদের যত কিছু অদ্ভুত আসবাব আছে সেগুলো কিছুই নয় এই আশ্চর্য পাখির গানের কাছে।—এ পাখির খবর কিছু রাখ ?'

তত্ত্বাবধানিক দেখলেন হুজুরের চোখ সম্পূর্ণ বন্ধ হতে আর লহমা-দুই বাকি ; তখন তিনি সেই সময়টুকু কাটিয়ে দেবার জন্যে রয়ে-বসে জবাব দিচ্ছেন—'হে প্রবল-প্রতাপ ! ভবদীয় দাসানুদাসের নিবেদন এই যে—মহারাজ রাজ্যের সংবাদ ও খবর অর্থাৎ যে খবর যথার্থ খবর—খবরের মত খবর, তা এ দাসের অবিদিত নাই। আজ্ঞাধীন সকল খবরই রাখে মহারাজ, কিন্তু এই কাল্পনিক পাখি, এর গানের ইতিহাস পুস্তকপ্রণেতার কল্পনা—যাকে পণ্ডিতেরা বলেন কবি-কল্পনা—সু-ত-রাং—!'

হুজুরের চোখ তখন পূর্ণ বন্ধ হয়েছে। তিনি বললেন—'হুঁঃ, কল্পনাই ব-টে—' তারপর আর তাঁর সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। পাখির খবরের দায় থেকে উদ্ধার হয়ে কর্মচারী পায়ে পায়ে সরে পড়েন, এমন সময় সেই দুষ্টু মশা আর-একবার হুজুরের কানে পোঁ করে ভেঁপু বাজিয়েছে। মন্ত্রী প্রায় দরজা পার হয়েছিলেন, কর্তার নিদ্রাভঙ্গ হতেই তিনি দুয়োরের গোড়ায় পাপোঁছখানার উপরেই ঝপ্ করে বসে পড়েছেন। কর্তা আর-একবার চশমা এঁটে কর্মচারীর দিকে ফিরে বললেন—'সব কথাই তুমি কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে চাও ! বিদেশের কেতাবে যখন এ পাখির কথা উঠেছে তখন এটা মিথ্যে হতে পারে না ; আমি জানি তারা কাজের মানুষ, আবোল-তাবোল বাজে বকা তাদের কুষ্টিতে লেখেনি। এই পাখির গান আমার না শুনলেই নয়। আজ সন্ধ্যার সময় তাকে আমার মজলিসে হাজির করবে, আমার গানের ওস্তাদ সবাইকেও নিমন্ত্রণ করবে—যাও।'

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দিচ্ছে, তত্ত্বাবধানিক ভাবতে ভাবতে চলেছেন, কেমন করে পাখির সন্ধান করি ? দেশের কেউ যার খবর জানে না তাকে ধরা তো সহজ নয় ! এমন

সময় হুজুর বললেন---'আমার এ ঘরে মশার উৎপাত হচ্ছে। আচাৰ্যিদের দিয়ে মশা হবার কারণটার তদন্ত অবিলম্বে করবে---পাঁজিতে এ বৎসর সকল প্রকার মক্ষিকার কোঠাতে শূন্য দেখছি অথচ মশার জ্বালায় নিদ্রা হচ্ছে না, এরই বা অর্থ কি!'

কর্তার চোখ খোলবার মূলে এই মশা। এই মশা-বংশ নির্মূল না হলে রক্ষা নেই, এটি বেশ করে আচার্যিদের সম্মুখে দিয়ে প্রধান কর্মচারী সদ্দার-মাজীকে পাখির সন্ধানে পাঠালেন। আজ এই দুটো বড় বড় কাজ সারতে তাঁর নাওয়া-খাওয়া হতে বেলা দুটো বাজল। ইতিমধ্যে কর্তার খানসামা তিনবার জেনে গেছে পাখি এল কি না।

তত্ত্বাবধানিক অতি গম্ভীর লোক। সকলের চেয়ে তিনি কম কথা বলেন, কম চলা চলেন। পাখি যে কী জানোয়ার এবং মশা যে কী পাখি, এটা তাঁর জানবার কোনোদিন প্রয়োজনও হয়নি, সুবিধাও ছিল না,—কাজের চিন্তায় তাঁকে এতই ব্যস্ত থাকতে হয়। লোকের দশটা প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ-পর্যন্ত মাত্র একটি 'চুট্'—তাও সম্পূর্ণ পরিষ্কার উচ্চারণ না করেই—বলে এসেছেন, আর তাঁকে আজ কর্তার প্রত্যেক প্রশ্নের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উত্তর দিতে হচ্ছে। এদিকে মাজী এসে জানালে পাখির কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছে না। এইসব উৎপাতে হয়রান হয়ে কর্মচারী যখন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন এবং পাখি না হাজির করতে পারলে মাথা কাটা যাবে, একথা চুপি-চুপি জানিয়ে উকিল ডেকে বিষয়-আশয়ের বন্দোবস্ত করে একটি উইল লেখবার উদ্যোগ করছেন, তখন তাঁর উকিল একটু মাথা চুলকে বললেন—'বলতে সাহস হয় না—একবার মজলিসী লোকদের নামের লিস্টিখানা উল্টেপাল্টে দেখলে হ'ত নি। যদি পাখি বলে কোনো কেউ হুজুরে কোনো কালে নিমন্ত্রণ-পত্রের জন্য সওগাদ দিয়ে থাকে তবে সহজেই তার ঠিক-ঠিকানা পাওয়া যাবে।

উকিলের কথামত দপ্তরখানার নামের তালিকা ঘেঁটে দেখা গেল, তাতে 'পা'য়ের কোঠায় ও 'প'য়ের কোঠায় অনেকগুলো পা ও পদাবওয়ালা নাম, কিন্তু 'পাখি' কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। তারপর দেশের সভাসমিতি কমিটিজমিটি এ-সভা ও-সভা এ-সমাজ ও-সমাজের বাৎসরিক রিপোর্টগুলো আনিয়ে কর্মচারী দেখলেন, সেখানেও পাখির নামগন্ধ নেই। দেশের গণ্যমান্য বুধ-বৃহস্পতি সভার সদস্যমণ্ডলী বলে পাঠালেন 'তাঁদের কমিটির একখানি কীটদষ্ট প্রাচীন রিপোর্টে পাওয়া যাচ্ছে যে, কর্মচারী যাঁর সন্ধান করছেন তাঁকে এই সভা থেকে একবার একটি সম্বর্ধনা ও রূপার তাম্রশাসন ও স্বর্ণলেখনী মায় মস্যাধার দেবার প্রস্তাব উঠেছিল এবং বাৎসরিক হিসাব-নিকাশে সভা তার একটা চুম্বকও পাচ্ছেন, কিন্তু উক্ত

রিপোর্টের সন তারিখ ইত্যাদি এমনভাবে কীটদণ্ট হয়েছে যে তার চিহ্নমাত্রও পাওয়া দুষ্কর। হুজুরের তহবিল থেকে কিঞ্চিৎ অর্থ-সাহায্য হলে কীট-ভাষা-তত্ত্ববিদ্‌গণের দ্বারা এই পুঁথির মাসপঞ্জী ইত্যাদি অংশ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব, অন্ততঃ উক্ত পুঁথির জন্য একখানা খেরুয়া বস্ত্র পেলেও আপাততঃ তাঁরা হুজুরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সুখী করতে পারেন।'

কর্মচারী আশা করেছিলেন দেশের সব সভা-সমিতিগুলোর নজির দেখিয়ে তিনি হুজুরের কাছে প্রমাণ করবেন—বিদেশী-মাত্রেই মিথ্যা কথা বলছেন, পাখি সম্বন্ধে তাঁদের কল্পনা ও জল্পনার মূলে কোনো তথ্য—যাকে বলে 'বস্তু' – তা নেই; কিন্তু বুধ-বৃহস্পতি কমিটির স্বর্ণলেখনী মায় মস্যাধার ও তাম্রশাসন পাখিকে কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দেওয়া বরং চলে কিন্তু সোনার মস্যাধার, রূপার তাম্রশাসন – এরা যে 'বস্তু', এদের জন্য যে খাতায় জমাখরচ লেখা রয়েছে, এর বিল আছে, ভাউচার আছে, রসিদ স্ট্যাম্প আছে,—এগুলোকে তো ওড়ানো সহজ নয়।

এদিকে বেলা পাঁচটা হয়; হুগুটায় মজলিস। কর্মচারী নিরুপায় হয়ে স-উকিল নিজেই একবার পাখির খবর করতে অগ্রসর হলেন। বলা বাহুল্য, যাত্রার পূর্বে কর্মচারী উকিলের পরামর্শমতো বুধ-সভাকে খুব ভয় দেখিয়ে একখানা চিঠি দিয়ে গেলেন যাতে ভবিষ্যতে রিপোর্টাদি বিষয়ে তাঁরা সতর্ক থাকেন এবং তাঁর দ্বিতীয় পত্র না পাওয়া পর্যন্ত এই পাখি সম্বন্ধে কোনো প্রকাশ্য সভায় কোনো আলোচনা না হয়— কেননা, হুজুরের কানে তাঁদের এই অসাবধানতার কথা গেলে সভার বার্ষিকী ও চাঁদা ও অন্যান্য বাবদে খরচাদি সরকার হইতে বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

কর্মচারী তাগা-তিলকাদি নানা ইণ্টিবিণ্টি দিয়ে আপনাকে বেশ সুরক্ষিত করে নিয়ে তবে পাখির সন্ধানে বাড়ির সদর দরজা পার হলেন, সঙ্গে সেই উকিল এবং হুজুরের সঙ্গীতাচার্য ও বুধ-বৃহস্পতি সভার জনকয়েক নামজাদা কবি ও লেখকবৃন্দ। মালীকে উকিল জেরা করে জানলেন যে, বাগানের আর সমস্ত অংশই সে তন্ন-তন্ন করে দেখেছে—কেবল ঐ দিকটা – যেটা পাণ্ডব-বর্জিত দেশের মতো – ওখানটি গিয়ে সন্ধান করতে সে সাহস পায় নি; কেননা, সে জাতিতে উড়ে; ওদিকের হাওয়া গায়ে লেগেছে শুনলে তার জাত নিয়ে টানাটানি পড়বে। রাজার তাড়ায় কর্মচারীর জাতের কথা ভাববার সময় ছিল না, তিনি 'চুট্' বলেই সেই নিষিদ্ধ দিকটাতেই অগ্রসর হলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলে চাদরের আড়ালে নাকগুলিকে নিষিদ্ধ দিকের হাওয়া থেকে ঢেকে নিয়ে কোনো রকমে জাতি রক্ষা করে কর্মচারীর অনুসরণ করলেন।

কর্মচারীর জাতি লোহার সিন্দুকে চব্‌সের ডবল তালার মধ্যে সুরক্ষিত ছিল, তার উপরে রাজ-আজ্ঞা, সুতরাং তিনি অনেকটা নির্ভয় ছিলেন।

এই পাণ্ডব-বর্জিত দিকে তখন বসন্তের ফুল ফুটেছিল, এত ফুল যে, তার সৌরভ চাদরের শত ভাঁজ দিয়েও ঠেকানো যায় না—কাজেই, জাতি জাতীফুলের জাঁতি-কলে বলির পাঁঠার মতো আর্তনাদ শুরু করেছে। কর্মচারী ধমক দিয়ে উঠলেন -'চুট্'। তাঁর সেই জলদগম্ভীর স্বরে একটা শুকনো কুয়োর ঘুমন্ত ব্যাং হঠাৎ বর্ষার স্বপ্নে মক্-মক্ করে খানিকটা বকে উঠল, এবং দূর বনে একটা বাছুর কোনো আকস্মিক উৎপাতের আশঙ্কায় হাম্বারবে হরি-স্মরণ করতে থাকল।

কর্মচারী ও তাঁর দলবল—এঁদের কারুর পাখির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় মোটেই ছিল না। কিন্তু 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল, কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল,'—এর মধ্যে থেকে যে সার বস্তুটুকু পাবার তা তাঁরা সকলেই পেয়েছিলেন। ফুল যখন ফুটেছে তখন হাম্বা ও মক্-মক্ যে পাখিরই রব সে বিষয়ে তাঁরা একমত হয়ে ঐ দুটো জীবকেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে চললেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা। উকিল সন্ধ্যাকালের রবগুলোকে পাখির রব বলে ধরা যায় কি না এবং একটা পাখি দুটো জীব হয় কী বলে,—এ-বিষয়েও একটু আপত্তি করায় 'অধিকন্তু ন দোষায়' এবং রাতি পোহানোটা যে প্রাচীন কবিদের মতে দিবানিদ্রার পরেই সায়ং-সন্ধ্যাটাকেই বলা হয় এটি বুধ-সভার কবি ও লেখকবৃন্দ সকলে মিলে সমস্ত পথটা তর্ক করে বোঝাতে বোঝাতে চললেন। এবং হুজুরের সঙ্গীতাচার্য এই দুই জীবের রবে কোথায় ওড়ব, কোথায় বা খাড়ব ষড়জ গান্ধার মধ্যম ইত্যাদির বিচার করে এদের গান হনুমানের মতে সিদ্ধ ও শুদ্ধ বলেই স্থির করে নিলেন,—যদিও কোনো-কোনো ওস্তাদ নন্দিকেশ্বরকে একেবারে ছেঁটে দিতে নারাজ ছিলেন। এক পাখির স্থানে দুই নিয়ে যখন সদলে কর্মচারী হুজুরের মজলিসে দেখা দিলেন তখন চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল এবং দুই পাখির সঙ্গীতের শ্রোতা এত জমে গেল যে, হুজুরের উঠোনে সকলের স্থান-সঙ্কুলান দুর্ঘট হয়ে পড়ল। কোনোমতে সকলকে তুষ্ট করে কর্মচারী হুজুরে হাজির হয়েছেন। হুজুরের তাকিয়ার বামপার্শ্বে বাতি ও পুষ্পমাল্য ও তাম্বুলাদি, আর দক্ষিণে অধ্যাপক শাস্ত্রী ও তত্ত্ববাগীশের দল। মজলিস দেশের গণ্যমান্য সঙ্গীতসভা-সংঘ ও সমিতির সদস্যে ভরা। এ ছাড়া খবরের কাগজওয়ালারও শুভাগমন হয়েছিল। অধ্যাপক প্রথমে স্বরচিত স্বস্ত-বাচন পত্রখানি পাঠ করলে পর কর্মচারী নম্বর-এক বিহঙ্গকে হুজুরে দস্তুরমতো পেশ করলেন, হুজুরও





তাঁকে যথাযথ আপ্যায়িত করে গানের জন্য ধরে পড়লেন। নম্বর-এক এতক্ষণ মাথা হেঁট করে ভালোমানুষটির মতো অপেক্ষা করছিলেন। হুজুরের অভয় পেয়ে বরাবর অধ্যাপকদের নিকটে গিয়েই উপবেশন করলেন এবং তাঁদের হাতের কুশ-মুষ্টির দিকে মুখ বাড়িয়ে একটি-মাত্র হাম্বারব করেই ক্ষান্ত হলেন। এখানে হুজুরের দৃষ্টি কর্মচারীর দিকে পড়বামাত্র তিনি দুই-নম্বরকে হাজির করলেন। মজলিসে প্রবেশ করেই নম্বর-দুই বাতির চারিদিকে ভ্রাম্যমাণ একটি মশাকে গ্রাস করে ফেললেন ; এবং হুজুরকে একবার মক্-মক্ শব্দে আশীর্বাদ করেই আকাশের দিকে দুই চক্ষু পাকিয়ে পুষ্পমাল্যের থালার উপরে গম্ভীর মূর্তি ধরে বসলেন।

সকলের মুখে কেমন একটু নিরাশ ভাব দেখা গেল এবং মজলিসের বাহিরের লোক যারা নিমন্ত্রণ পায় নি তারা যেন একটু টিটকারি দেবার উদ্যোগ করলে। সকলকারই মনে হচ্ছে পাখি সম্বন্ধে কোথায় যেন একটু গোল রয়ে গেল। হুজুর পর্যন্ত কেউ তাঁরা পাখিকে কখনো দেখেনও নি, দেখবার চেষ্টাও পান নি। সুতরাং সবাই বিরক্ত হয়ে বসলেন এবং দুই জীবের সুর লয় তান নাদ নিনাদাদি সম্বন্ধে বিচার ও সুখ্যাতির চূড়ান্ত করে ও বিদেশীরা যে পাখির সুখ্যাতি করেছেন তাকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দিয়ে মজলিস ভঙ্গ করলেন। পণ্ডিত এই সময় কর্মচারীর কানে গিয়ে পরামর্শ দিলেন—'ওহে, এ দুটোকে হুজুরে কী বলে হাজির করলে ? এর একটি গোবৎস আর একটি কূপমণ্ডুক,—কোনো রূপেই পাখি নয়। একটিকে গোরক্ষিণীতে পাঠিয়ে দাও, আর-একটি নিয়ে তুমি মশা-বংশকে ধ্বংস কর গিয়ে।' কর্মচারী এতগুলো কথার জবাবে বললেন—'চুট্‌!'

মজলিসের দেউড়ির বাইরে সেই কচি মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল। সে কর্মচারীকে আসল পাখির খবর দিতেই এসেছিল। কিন্তু পণ্ডিতের দুরবস্থা দেখে সে আর কর্মচারীর কাছে যেতে সাহসই পেলে না।

হুজুর ঘরে এসে মিথ্যার ঝুড়ি বিদেশী বইগুলোকে জ্বালিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। কর্মচারীর ঘর থেকেও সেদিন অনেক রাত্রে একটু কাগজ-পোড়া গন্ধ পাওয়া গিয়েছিল আর বুধ-বৃহস্পতি সভার পুঁথি-রক্ষককে ওখান থেকে ঠিক তেমনি সময়েই পকেটে হাত দিয়ে হাসিমুখে বার হতে দেখা গিয়েছিল।

বিদেশীর 'সুরসিক সভায়' হুজুরের মজলিসের বিবরণ এবং পাখির সম্বন্ধে উক্ত মজলিসের চূড়ান্ত মীমাংসার খবর পৌঁছেছিল নিশ্চয়ই। কেননা, হুজুরের যারা হুজুর এমন সব দেশীয় ছেলে-ছোকরা ও স্কুল-বয়ের দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে বুড়ো বুড়ো যত বিদেশীয়

মহাপণ্ডিতেরা হুজুরকে একটি রঙচঙে টিনের পাখি প্রাইজ পাঠালেন, তার পেটে একটা গ্রামোফোন ও মোহিনী ফ্লুট পোরা ছিল। শুভদিন দেখে দেশের যত লক্ষ্মী ছেলেরা সেই পাখিটি নিয়ে খুব ঘটা করে হুজুরকে একটি অভ্যর্থনা দিতে এল এবং মজলিসের মধ্যখানে এসে যন্ত্রটায় কষে দম লাগিয়ে দূরে গিয়ে অপেক্ষা করে রইল। দু-চারটে মোটা গলা, দু-দশটা মিহি গলার গানের পর ফোনটা একেবারে চুপ করেই প্রকাণ্ড ঝড়ের মতো একটি হাসি শুরু করলে,—সে একেবারে বিলিতি হাসি, তার চোটে হুজুরের পুরানো মজলিস-ঘরের দেওয়াল চটে ফেটে চৌচির হয়ে হাওয়ার মুখে তাসের বাড়ির মতো ভেঙে পড়ল—একেবারে হুজুর, তাঁর কর্মচারী ও সদস্যবৃন্দের ঘাড়ের উপরে। ঠুনকো মাটির দেওয়াল, আঘাত মোটেই মারাত্মক হল না, কেবল সকলে বিষম ভয় খেয়ে চিৎকার করতে লাগল—'ওরে, গোহত্যা করলে রে!' এই সময় পাণ্ডব-বর্জিত দিক থেকে যত লক্ষ্মীছাড়া—তারা সেই ছোট জাতের মেয়েটিকে কাঁধে নিয়ে হুজুরের ভাঙা মজলিসে দল বেঁধে দেখা দিলে। সেই মেয়ের গলায় পাখি গানের সুর হীরের সাত-নলী হারের মতো ঝকঝক করছে।

# কনকলতা



সুন্দর রাজার কালো মন্ত্রী। মন্ত্রীর সাত ছেলে, তারা কালো-বান্দোর, আর এক মেয়ে—সে নিখুঁত সোন্দর। মন্ত্রী মেয়ের নাম দিলেন---কনকলতা। কালো ছেলেদের কারো নাম দিলেন রামু, কারো সামু, কারো ধামু! যার যেমন মুখ তার তেমনি নাম—যেমন সব কেলে হাঁড়ি আর কেলে হাতা।

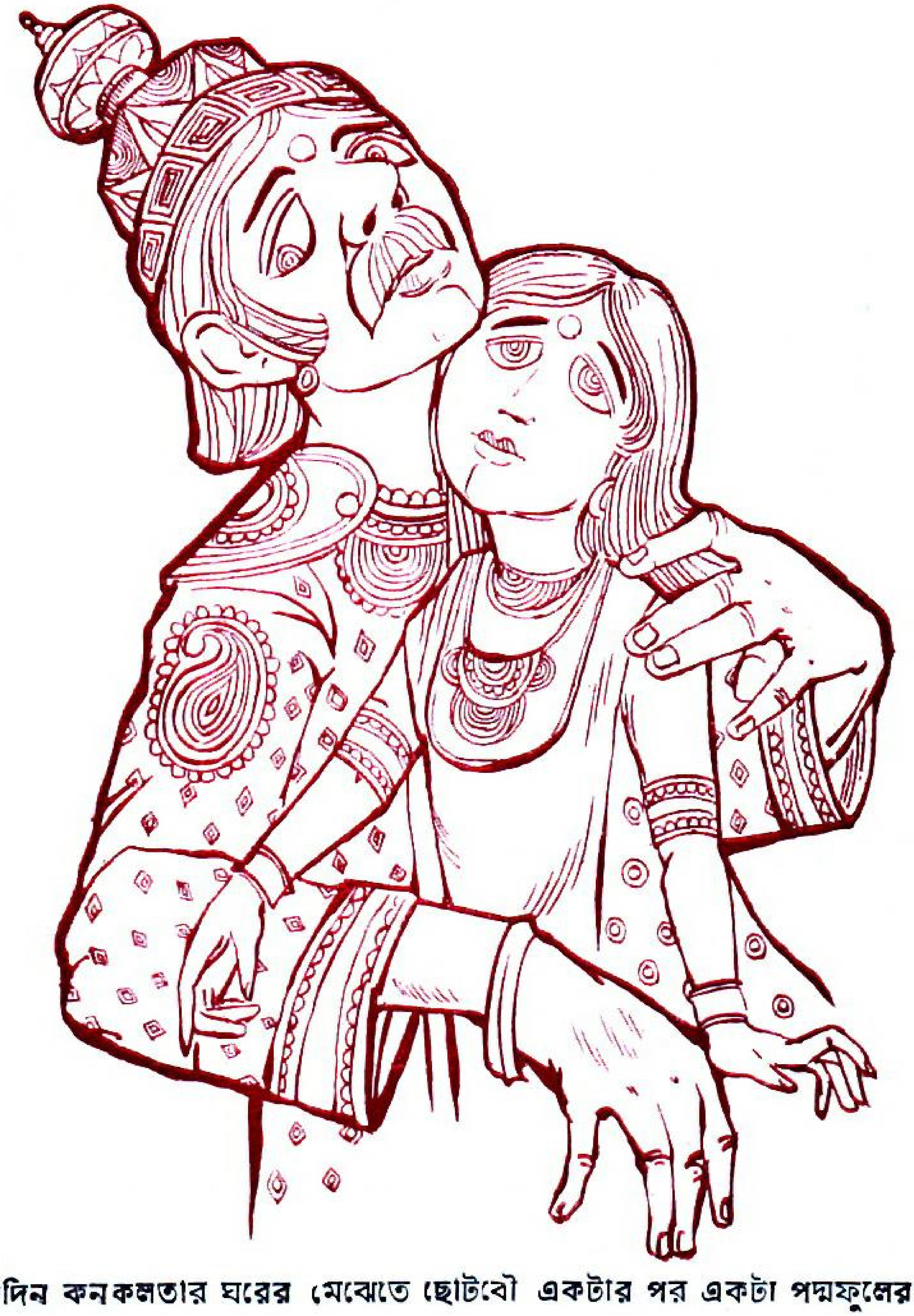
মন্ত্রীর কোলে-কোলেই কনক-লতা থাকে আর মানুষ হয়, ছেলে-গুলো পড়ে থাকে কাদায় ধুলোয় পাঁকে।

কনকলতা দিনে দিনে বাড়ে আর দাদারা তাকে ডাকে—আয় না, মাটিতে নেমে ধুলো খেলবি? কনকলতা নামতে যায়, মন্ত্রী তাকে ধরে পালঙ্কে শুইয়ে দেয় মশারি টেনে দেয়— রূপো-সোনার মিহি জাল! সেখান থেকে দেখা যায় বাইরের ধুলো, কিন্তু বেরিয়ে আসা যায় না কোনোমতেই। কনকলতা খাঁচার পাখির মতো মশারির মধ্যে বসে কাঁদে আর তার দাদারা ছাড়া-পাখির মতো মশারির বাইরে বসে ডাকে—আয় আয়, খেলি আয়!

এমনি করে দিন যায়। কালো হলে কি হয়, মন্ত্রীর ছেলে তো বটে! সবার সুন্দর বৌ এসে গেল। মেয়ে রইল আইবুড়ী গুড়িসুড়ি—সেই মশারির মধ্যে। বাড়ির ছোট বৌ সে আগে যায় কনকলতার ঘরে বসে বসে গল্প করে—রাজপুত্তুরের গল্প। কনকলতা বলে—তাকে দেখাতে পার? ছোটবৌ বলে, পারি যদি না থাকে মশারি।

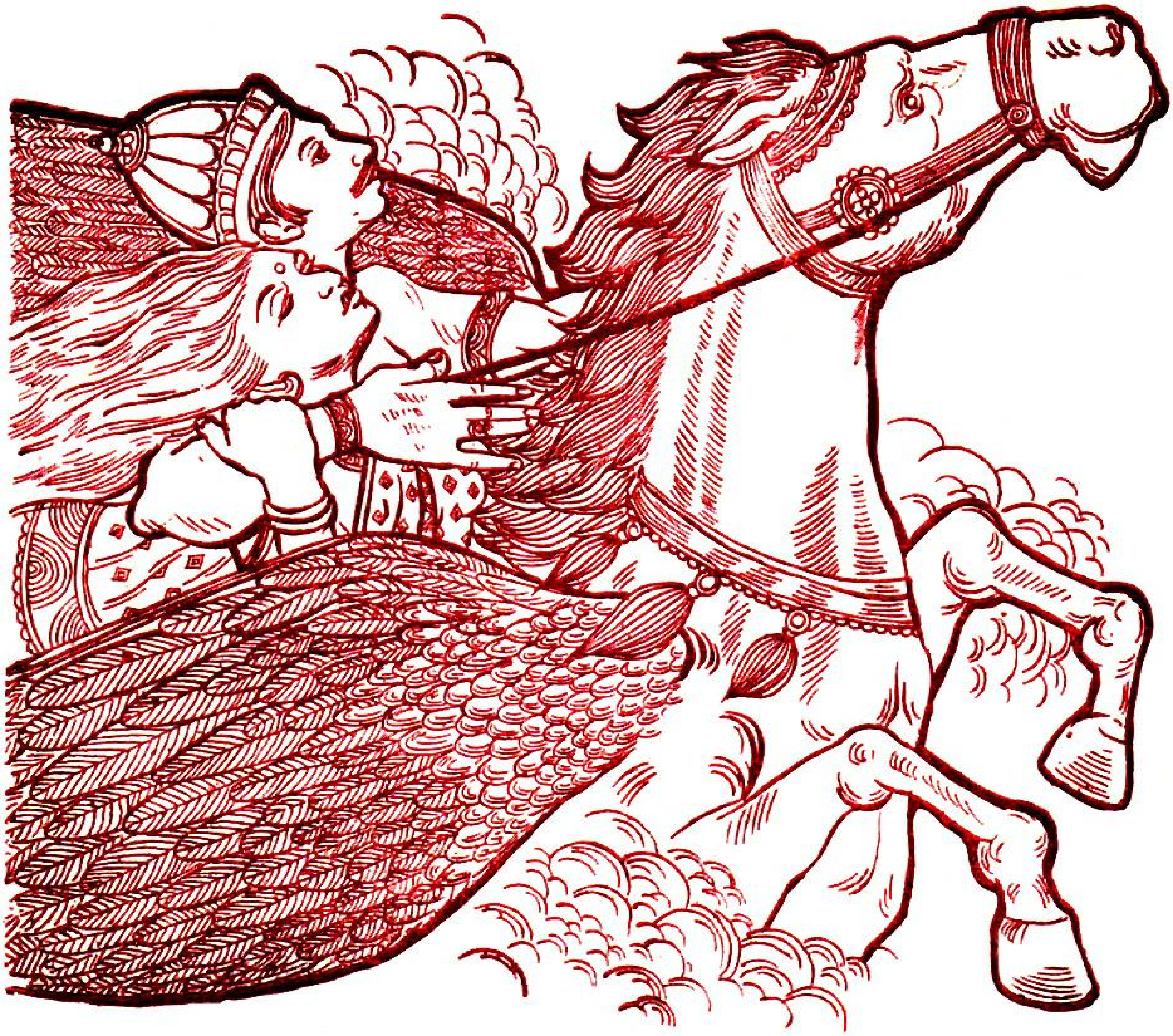
কনকলতা কত ফন্দি করে মশারি খুলতে। সোনা-রূপার জাল ছেঁড়েও না খোলেও না।

সেকরা একদিন ছোট বৌয়ের গয়না গড়াতে এল—হাতে তার সোনাকাটা কাঁচিখান। ছোটবৌ চুপি চুপি সেটা লুকিয়ে রাখলে।



একদিন কনকলতার ঘরের মেঝেতে ছোটবৌ একটার পর একটা পদ্মফুলের আলপনা দেয় আর হাসে! কনকলতা দেখে-দেখে বলে—হাসছ কেন?

ছোটবৌ বলে – আজ তোকে ঘরের বাইরে নেবো। কনকলতা চোখ মুছে বলে—জাল যে ঘেরা রইল ভাই। ছোটবৌ ছোট্ট কাঁচি দেখিয়ে বলে—দেখছিস, এই অস্তরে জাল কাটবো। কনকলতা চেয়ে থাকে, ছোটবৌ জাল কাটে—মশারি খুলে যায়, মেয়ে নামে ভুঁয়ে।



আলপনার পদ্মে পা রেখে রেখে চলে। দুয়োর গোড়ায় এসে ভয় পায়, মশারিতে ঢুকতে যায়। ছোটবৌ তার হাত ধরে বাইরে আনে। রাজপুত্তুরের হাতে সঁপে দেয় কনকলতাকে। পক্ষিরাজ ঘোড়া উড়ে চলে যায় মন্ত্রীর মেয়ে আর রাজার পুত্তুরকে নিয়ে রাজভবনে। সেখানে দু'জনে বিয়ে হয় মালা বদল করে।

রাজার ঝি, রাজার বৌ তারা সব সুন্দর। কারো নাম পদ্মমুখী, কারো নাম চম্পাকলি। নতুন বৌ দেখে বলে, ওমা, এই বুঝি! তোর নাম কি লা? কনকলতা চোখ মুছে বলে—কনকলতা। 'আমার মাথা'—বলে রাজার ঝি রাজার বৌ তারা চলে যায়। মন্ত্রীর মেয়ে রাজপুত্তুরের গলা ধরে কাঁদে আর বলে – ওগো, আমি সত্যি কনকলতা। রাজ-পুত্তুর হেসে বলেন—তা তো জানি, ওরা শুধুই নামে কেউ পদ্মমুখী কেউ চম্পাকলি। আড়াল থেকে রাজার ঝি, রাজার বৌ—তারা বেরিয়ে এসে বলে—আহা, কনকলতাকে আমাদের মালঞ্চে পুঁতে দিলে হয় না?—আমরা ফুল পরে বাঁচি। কনকলতা ভুরু কুঁচকে বলে—পুঁতে দেখনা, ফুল ফোটে কি না কনকলতায়; রাজার ঝি, রাজার বৌ কিনা—যেমন কথা তেমনি কাজ!

সবাই ধরাধরি করে পুকুরঘাটে কনকলতাকে পুঁতে রেখে এল দিনের বেলায়। রাজপুত্তুর নাইতে এসে দেখেন পুকুরপাড়ে সোনার লতায় থোকা-থোকা ফুল ঝুলছে। তিনি দুটি ফুল তুলে মা-বাবাকে দেন, রাজার ঝি, রাজার বৌদের পাঠান: আর এক বোঁটায় দুটি ফুল নিয়ে যান পুজোর ঘরে। ঠাকুরের পায়ে ফুল দিতে কনকলতা সামনে এসে দাঁড়ায়। রাজপুত্তুর বলেন—তুমি! 'আমিও পুজোয় এসেছি—' ব'লে কনকলতা রাজপুত্তুরকে প্রণাম করে বলে সকল কথা।

রাজার ঝি, রাজার বৌ – তারা খোঁপায় সোনার ফুল সাজিয়ে পুজো দিতে আসে—কনকলতাকে দেখে রাজপুত্তুরের পাশে। কনকলতার রূপে তাদের চোখ ক্ষয়ে যায়। বুড়ো রাজা-রানী আসেন মন্ত্রীর সঙ্গে পুজো দেখতে। রূপ দেখে রাজা-রানী অবাক হয়—মন্ত্রীর চোখে জল বয় থেকে-থেকে।

# দেয়ালা



এক যে ছিল গাছ, তার ছিল এক ছাওয়া : এক যে ছিল মাঠ, তার ছিল এক গাছ। আর এক যে ছিল কুঁড়ে, তার ছিল একটা ঝাঁপ—সেটা কখন খুলতো, কখন বন্ধ হতো। ঝাঁপ যখন বন্ধ হতো, তখন ঘরটা কিছুই দেখতো না, অন্ধকারে পিদুম জ্বালিয়ে কুঁড়ে নিজের ভিতরটার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকতো— পিদুমের আলো ঝিমোতো, ঘরের জিনিসপত্র ঝিমোতো, ঘরের মধ্যে যে কুড়ে মানুষগুলো তারাও ঝিমোতো, কিন্তু ঝাঁপ খুললে আর রক্ষে নেই—পিদুমের আলো পিলসুজ ছেড়ে দৌড় দিত—সেই যে মাঠে যেখানে গাছ আর গাছের ছাওয়াতে কথা চলা-চলি করছে। ছাওয়া শুধোচ্ছে গাছকে—ভাই, কি দেখছিস ?

ছোট গাছ, সে এদিক ওদিক চায়, চোখের পাতা মেলে আর বলে, মাঠ দেখছি।

মাঠের পরে কি ভাই ?

মাঠের পরে একটা তালগাছ দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

তারপর ?

গাছটা হঠাৎ চুপ করে আর থির হয়ে চেয়ে থাকে। গাছের ছাওয়া সেও চুপচাপ গল্প শোনবার জন্যে সটান শুয়ে থাকে মাটিতে।

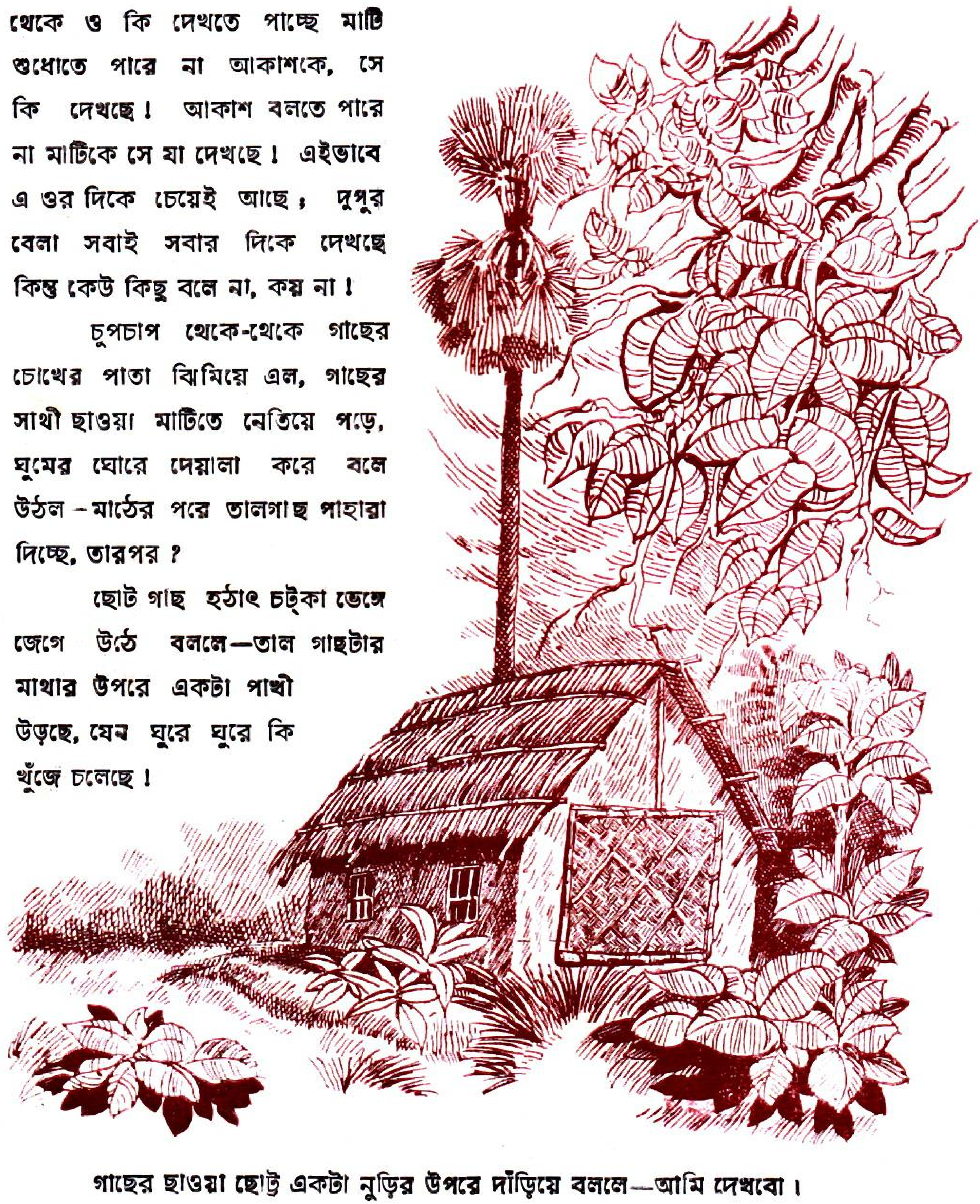
ধূ ধূ মাঠের ধুলোমাটি, খোয়াই-জোড়া রাঙা মাটি বাঁধের ধারের পোড়া মাটি— তারা তো চেনে না ছোট গাছ আর তার এতটুকু ছাওয়াকে। তারা চলে যায় সেই যে তালগাছ আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে তার কাছে, আর বলে - দেখলে কিছু ?

তালগাছ দাঁড়িয়েই থাকে—হেলে না, দোলে না, বলে না কিছু। তেপান্তর মাঠ স্তব্ধ হয়ে ভাবে— এত উঁচু থেকেও দেখা যায় না ? অবাক হয়ে মাঠ চেয়ে থাকে—খুব উঁচুতে যে নীল আকাশ তারই পানে, আর মনে-মনে বলে—আকাশকে কেমন করে শুধোই ওখান

থেকে ও কি দেখতে পাচ্ছে মাটি শুধোতে পারে না আকাশকে, সে কি দেখছে। আকাশ বলতে পারে না মাটিকে সে যা দেখছে। এইভাবে এ ওর দিকে চেয়েই আছে; দুপুর বেলা সবাই সবার দিকে দেখছে কিন্তু কেউ কিছু বলে না, কয় না।

চুপচাপ থেকে-থেকে গাছের চোখের পাতা ঝিমিয়ে এল, গাছের সাথী ছাওয়া মাটিতে নেতিয়ে প'ড়ে, ঘুমের ঘোরে দেয়ালা করে বলে উঠল – মাঠের পরে তালগাছ পাহারা দিচ্ছে, তারপর ?

ছোট গাছ হঠাৎ চট্‌কা ভেঙ্গে জেগে উঠে বললে—তাল গাছটার মাথার উপরে একটা পাখী উড়ছে, যেন ঘুরে ঘুরে কি খুঁজে চলেছে।



গাছের ছাওয়া ছোট্ট একটা নুড়ির উপরে দাঁড়িয়ে বললে—আমি দেখবো।

বাতাস এতক্ষণ চুপ করে ছিল, বলে উঠলো—ইস্‌স্‌ !

ছোট গাছ হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল !

মাঠের শেষে পাহারা দিচ্ছিল যে উঁচু গাছ সে এইবার মাথা নেড়ে বললে—দেখবেই তো, দেখবেই তো ! লজ্জায় ছোট গাছের ছাওয়া মাথা হেঁট করে মাটিতে মিলিয়ে গেল।

সন্ধ্যার আকাশের কোলে দেয়ালা দিচ্ছিল একখানি মেঘ, একবার সে রঙীন আলোয় রাঙা হয়ে উঠেই আবার ঘুমিয়ে পড়লো—নীল আকাশের আঁচলের আড়ালে। এমন সময় গাছ বলে



উঠল—ছাওয়া ! সাড়া নেই ! গাছ ফিরে-ফিরে দেখে - ছাওয়া পালিয়েছে। গাছ মাটিকে বললে— ছাওয়া গেল কোথা ? মাঠ বললে—এই তো ছিল গেল কোথায় ?

তালগাছ বললে—হাওয়ার মতো কে যেন ঐ পুব মুখে রোদে পুড়তে পুড়তে চলে গেল আমি দেখেছি।

আকাশ বললে—শুধোই তো রোদকে হাওয়া যায় কোন্ খানে ?

সেই তালগাছের ওপারে যে তেপান্তর মাঠ, তার ওপারে যে নদী, তারও ওপারে যাকে ঝাপসা দেখা যাচ্ছে, তার কোণে যে রোদ সে দেয়ালা দিয়ে হেসে বললে—বলবো না।

তার পরেই আলোর চোখ ঢুলে পড়লো। সবাই—এমন কি গাছের পাতা, ফুল, পাখি, ঘাটে মাঠে হাটে যে যেখানে ছিল বলে উঠল, কোথায় গেল সে ? কোন্ দেশে ? গাছ আর মাঠ আর আকাশ আর বাতাসের মন ছোট হাওয়াকে খুঁজে যখন কোথাও পেলে না তখন তারা মুখ আঁধার করে ভাবতে লাগলো - গেল কোথায়, এই ছিল ? তারপর সবাই ঘুমিয়ে গেল ঘরের বাইরে ; শুধু তারাগুলো থেকে-থেকে দেয়ালা করে চায় আর ভাবে গেল কোথায় ?

গাছ ঘুমোয়, গাছের পাতা ঘুমোয়, মাঠ-ঘাট ঘুমোয়, মেঝেয় পড়ে কুঁড়ে মানুষ ঘুমোয়—সবাই স্বপন দেখে হাওয়া তাদের বড় হয়েছে। সেই সে এতটুকুখানি হাওয়া—যে মাঠের শেষ দেখতে চাইতো, পাখিদের সঙ্গে পাখি হয়ে উড়ে পালাতে চাইতো আকাশের শেষে—সে এখন সেই সব তেপান্তর মাঠের চেয়ে সেই নীল আকাশের চেয়ে বড় হয়ে গেছে ! ভয়ে গাছ-পালা মাঠ-ঘাটের গা ঝিম-ঝিম করতে থাকে আর একবার চমকে উঠে তারা স্বপন দেখে, দেয়ালা করে, হাসে, কাঁদে, চায় আর ঘুমোয়। অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে - সাঁতরে চলে একটার পর একটা বাদুড় হাওয়াকে খুঁজতে-খুঁজতে দূর-দূর দেশে। সেই সময় চুপি চুপি আলো আসে —একটুখানি চাঁদের আলো—বাতাসের গায়ে আলো পড়ে, গাছের শিয়রে আলো পড়ে, ঘুমের ঘোরে সবাই বলে—হাওয়া ? ঘুম ভাঙানো পাখি ডেকে বলে—ওই যে আলো, ওই যে হাওয়া ! চমকে উঠে গাছ দেখে হাওয়া !

হাওয়া বলে—তারপর ?

গাছ বলে—ধু ধু করছে মাঠ তার মাঝে একটি গাছ পাহারা দিচ্ছে—চুপ করে দাঁড়িয়ে।

হাওয়া বলে -দেখনা ভাই ভাল করে তার পরে কি ?

গাছ বলে—সেই একটি গাছ তার পরে রয়েছে আলো, না আলো তো নয়, একটা আলো মাখা মেঘ !

ছায়া বলে—সে আবার কি ?

গাছ বলে—তা জানিনে ভাই কিন্তু কালো ঠিক তোর মত ঠাণ্ডা রং তার। হটাৎ ছাওয়ার উপর দু-ফোঁটা জল পড়ে—।

ছাওয়া বলে - ওকি কাঁদছিস্ কেন ?

গাছ মাথা দুলিয়ে বলে - কাঁদবো কেন ?

ছাওয়া বলে—এই দেখ না জল।

কুঁড়ে তার ঘরের ঝাঁপখানা ঝুপ করে বন্ধ করে দিয়ে বলে—বিষ্টি রে বিষ্টি।

টিপির টিপির জল ঝরে, আকাশ ঝিলিক্ দিয়ে থেকে-থেকে দেয়ালা করে, বাতাস করে সারারাত এপাশ-ওপাশ। তারপর রাত কাটে, সকাল হয়, আকাশ জেগে ওঠে, আলো জেগে ওঠে, গাছপালা জেগে ওঠে, পাখি জেগে ওঠে, সেই সঙ্গে তাদের ছায়ারাও জেগে ওঠে।

ছোট গাছের ছাওয়া বলে গাছকে—আজ কি খবর ?

গাছ বলে—আজ দেখছি কি জানিস ?

ছাওয়া বলে—কি ?

গাছ বলে—সেই আমাদের পাতার ঢাকা কুঁড়ি আজ ফুটেছে।

ছাওয়া বলে—তারপর ?

গাছ বলে—রোদ পড়ল তার গায়ে, বাতাস তাকে দুলিয়ে গেল।

ছাওয়া বলে—ওকে আমায় দে।

গাছ বলে—এই নে দেখ্ কেমন সুন্দর ফুল।

ফুলকে বুকে নিয়ে ছাওয়া বলে—ফুল ! ফুল কথা কয় না।

ছাওয়া গাছকে বলে—ফুল কথা কয় না যে ?

গাছ বলে—ঘুমিয়ে আছে, জানিস্‌নি। ফুল ঘুমিয়ে থাকে ছাওয়ার বুকে, ছাওয়া নড়ে চড়ে ফুলকে দেখে। গাছ নড়ে চড়ে শুধোয়—কি করছে ?

ছাওয়া বলে—ঘুমোচ্ছে। এক এক সময় বাতাস এসে ফুলকে ছুঁয়ে যায়। ছাওয়া বলে—দেয়ালা করছে আমাদের ফুল। কুঁড়ের ঝাঁপ খুলে দেখে মানুষ, গাছের তলায় ঝরা ফুল, তার গায়ে ছাওয়া হাত বোলাচ্ছে। কুঁড়ে মানুষের ছেলেটা বেরিয়ে আসে, ফুল তোলে বেড়ায় গাছে গাছে।

গাছ বলে—কি করবি ফুল নিয়ে ?

ছেলে বলে—খেলা করবো। ফুল তুলে ছেলে চলে যায়। মেয়ে আসে, সে এতটুকু – গাছে হাত পায় না, ছাওয়ায় ছাওয়ায় ফল কুড়িয়ে বেড়ায়।

ছাওয়া বলে—কি করবি ফুল নিয়ে?

মেয়ে বলে—ওকে মালায় গেঁথে ধরে রাখবো।

ছাওয়া বলে—তারপর খেলা হলে ফিরিয়ে দিবি তো?

মেয়ে 'দোব না' বলে ফুল আঁচলে তুলে নেয়।

ছাওয়া তার পা জড়িয়ে বলে—'নিয়ে যেও না'।

গাছ বলে —যাক না নিয়ে, কাল সকালে দেখবি তোর ফুল পালিয়ে এসেছে তোর বুকে। দিন কাটে, রাত কাটে, ফুলের স্বপন দেখে গাছ আর গাছের ছাওয়া দুজনে মিলে; সকালে কুঁড়ি ফোটে গাছে, ফুল ফেরে ছাওয়ার কোলে।

# মহামাস তৈল



সায়দা-বাদের ময়দা
কাশিম-বাজারের ঘি।
একটু বিলম্ব কর
লুচি ভেজে দি।

কিন্তু তর সইল না। ন-পাড়ার মধু খাতাঞ্চির ডানপিটে ছেলেটা রাস্তায় খেলতে খেলতে আদুল গায়ে খালি পায়ে গোরা ফৌজের সঙ্গ নিয়ে সরাসর পাটনায় গিয়ে হাজির। তখন নানা সাহেবের সঙ্গে লড়াই চলছে; সেই মরসুমে চাকরি পেয়ে গেল মধু খাতাঞ্চির কালো ছেলেটা,—কাপ্তান সাহেবের বুট পালিশের চাকরি, তার সঙ্গে ঘোড়া মলা, চিঠি বওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকগুলো কাজ যা করতে দু-এক গৎ ইংরিজি শেখা ছাড়া উপায় ছিল না রামধনের। লড়াই যখন শেষ হয়েছে তখন রামধন এতটা ইংরিজি শিখেছে যে সত্যি মিথ্যেয় মিলিয়ে একটা চটি বই লিখেছে—নানা সাহেবের যুদ্ধের ইতিহাস। সেই ইতিহাস সে একদিন সুযোগ বুঝে কাপ্তান সাহেবের খানার টেবিলে ছোট হাজরির সঙ্গে পরিবেশন করে বসলো। কাপ্তেনের মেম সেটা পড়ে এত খুশী হলেন যে তৎক্ষণাৎ রামধনকে তিনি সাহেবের এক-জোড়া পুরোনো বুট মায় সিকি বোতল বুটের কালি উপহার দিলেন এবং সাহেবকে বলে কয়ে এক সুট পুরোনো কাপড়ও দেওয়ালেন তাকে।

লড়াই শেষে রামধন সাহেব সেজে দেশে হাজির। বইখানাও তার গেল ছিরামপুরে ছাপা হতে আঠারো শত উনপঞ্চাশ খৃঃ অব্দে পয়লা এপ্রিলে।

হোলদারি বুট আর মাথামুণ্ডু নানার কাহিনী—এরি জোরে রামধন হয়ে উঠলো দেশের একজন কেষ্টবিষ্টু। তার দপ্‌দপার চোটে গাঁয়ের লোক শশব্যস্ত হয়ে তার নামে একটা ছড়া রচনা করে ফেললে, রচয়িতা কে তার ঠিকানা নেই, কিন্তু নাম হল কবিরাজ মশায়ের—

রামা এলেন গাঁয়ে
বুট্ জুতুয়া পায়ে,
ওরে কে বলিবে কালো।
পাটনা থেকে হলুদ মেখে
গা হয়েছে আলো।



খড়ের চালে আগুন যেমন, তেমনি এই গীতটা দেখতে দেখতে ন-পাড়া এবং সারা তল্লাট্টায় ছড়িয়ে পড়লো। ছেলেদের আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না, তারা এ ওর মুখ থেকে লুফে নিয়ে গানটার ধুলোট শুরু করে দিলে দু-বেলা পথে ঘাটে এবং বিশেষ করে খাতাঞ্চি সাহেবের কোটা বাড়ীর সামনেটাতে।

একটা ভাঙা দোনলা বন্দুক নিয়ে রামা মাঝে মাঝে তাড়া করলে ছেলেদের। তারপর সে পাড়া ছাড়বার আয়োজন করলে কিন্তু যাবার আগে কবিরাজ মশায়কে একটু শিক্ষা দেবার কুমতলব তার মাথায় এল।

ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদপত্র-প্রভাকর তখন দেশের সবাই পড়ে। একদিন সকালে কবিরাজ মশায় তামুক ধরিয়ে বাবুদের বৈঠকখানায় বসে গালগল্প করছেন এমন সময় কর্তা এসে বললেন —কবিরাজ মশায় দেখেছেন কাগজে আপনার নামে কি বেরিয়েছে!

কি কি!—বলে কবিরাজ কাগজটা টেনে নিয়ে দেখেন বড় বড় করে ছাপা—রামা খাতাঞ্চি প্রশংসাপত্র দিচ্ছেন ন-পাড়ার শ্যামনাথ কবি-রাজকে যথা ঃ—"ন-পাড়ার কবিরাজ মশায়ের প্রস্তুত মাসতৈল আমি পাটনা হইতে ফিরিয়া পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতেছি। ইহাতে হোল্‌দারি বুট সুন্দর পালিশ হয়, বিশেষতঃ বাত রোগীর জুতা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাঁকিয়া চুরিয়া গেলে এই তৈল বাঁকাকে সোজা করার পক্ষে বিশেষ কাজে আসে, ইহা আমি পরীক্ষা করিয়া বলিতেছি।"

কবিরাজ ছিলেন বিষম গম্ভীর লোক—রাগলেন কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু তিনি কর্তাবাবুর অনেক পীড়া-পীড়ি সত্ত্বেও প্রভাকরের নামে কিছুতেই মানহানির মকদ্দমা আনতে রাজি না হয়ে গুম্ হয়ে খানিক বসে থেকে বৈঠকখানা ছেড়ে উঠে সোজা বাড়ীর দিকে চলে গেলেন দেখা গেল।



যেমন রামধনের গীত তেমনি প্রভাকরের খবরটাও দেখতে দেখতে আগুনের মত পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে পড়লো। পাড়ার ছেলেরা কোমর বেঁধে কবিরাজ মশায়কে এসে বললে—বলেন তো রামাকে শিক্ষা দিয়ে আসি, আপনার সঙ্গে লাগে এত বড় সাহস তার!

কবিরাজ হেসে বললেন -তোরা সব ঘরে যা, এখন ডাক্তারি মালিশের দিন এল, মাসতৈল তো কেউ আর নেবে না, বুট পালিশে লাগে যদি তেলটা লাভ তো কম হবে না বরং বাড়বেই দাম, যা তোরা পাঠশালে যা!

এই ঘটনার পর থেকে তিন রাত্রি যেতেই শোনা গেল রামধন তার বুট পরে দাওয়া থেকে উঠোনে নামতে পা পিছলে পড়ে একেবারে খোঁড়া হয়ে শয্যাগত, উত্থান-শক্তি রহিত, বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে!

ছেলের দল হোররা দিয়ে কবিরাজ মশায়কে এই খবরটা দিতে এসে দেখছে কবিরাজ বাড়ীতে নেই, দরজায় এই বিজ্ঞাপন আঁটা বড় বড় করে হাতের লেখায়।—"মাস-তৈলের অপব্যবহারে বাতও সারে না হাড়ও ভাঙ্গে এইটুকু মানিয়া আমি কাশী যাত্রা করিলাম, অপব্যবহারীর গঙ্গাযাত্রার ভার বালকদের উপরে রহিল।"

# রতা শেয়ালের কথা



শেয়াল নিজের গড়ে গিয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আরাম করুন, এদিকে হিমে গাছতলায় পড়ে ভোম্বলদাস তপস্যা করতে থাকুন। ওদিকে কি, রাজার চর টিকটিকি, সে নতুন রাজা সিংহের কাছে শেয়ালের এ সব খবর প্রকাশ করে দিয়েছে, আর অমনি সিংহ হুহুঙ্কার ছেড়েছেন।

তখন ফাল্গুন মাস; হিমালয়ের চুড়োয় বরফ জমাট বেঁধেছে কিন্তু সুন্দর বনে বসন্ত-কাল নতুন দেখা দিয়েছে—ফুলে-ফলে পাখির গানে মধুর গন্ধে জলস্থল মাতিয়ে তুলেছে। সবুজ পাতার চাঁদোয়ার তলায় দাঁড়িয়ে সিংহ-সিংহিনী ডাক ছাড়লেন, নিমন্ত্রণ-চিঠি পেতে কারো আর দেরি হ'লো না। জীবজন্তু যে যেখানে ছিল সব কাজ ফেলে সভায় এসে হাজির হতে লাগলো। বকা-ধাম্মিক সব আগে এসে লম্বা পায়ের ধুলো রাজা-রাণী ছাড়া আর সবার মাথায় বুলিয়ে দিয়ে, ঠোঁটে কোরে একটুখানি আঁশ-জল ছিটিয়ে রাজা-রাণীকে "জয় জীব—স্বস্তি স্বস্তি" বোলে আশীর্বাদ কোরে বসলেন। হরবোলা পাখী রাজার বিদূষক, ময়না রাণীর সেভাৎনী—দুজনে এসে ভাঁড়ামো জুড়ে দিলে। ভাল্লুক-মন্ত্রী, বাঘা-কোটাল, সেনাপতি-গজপতি, খড়্গ—সিং বরকন্দাজ, মহিষ-মহিষী, গোরু-গাধা-ছাগল-ভেড়া ছোট-বড় পাত্র-মিত্র সবাই একে-একে এসে জুটলো।

সিংহ শেয়ালের কথা পাড়লেন,—"এক যে ছিল শেয়াল তার বাপ একদিন আমার

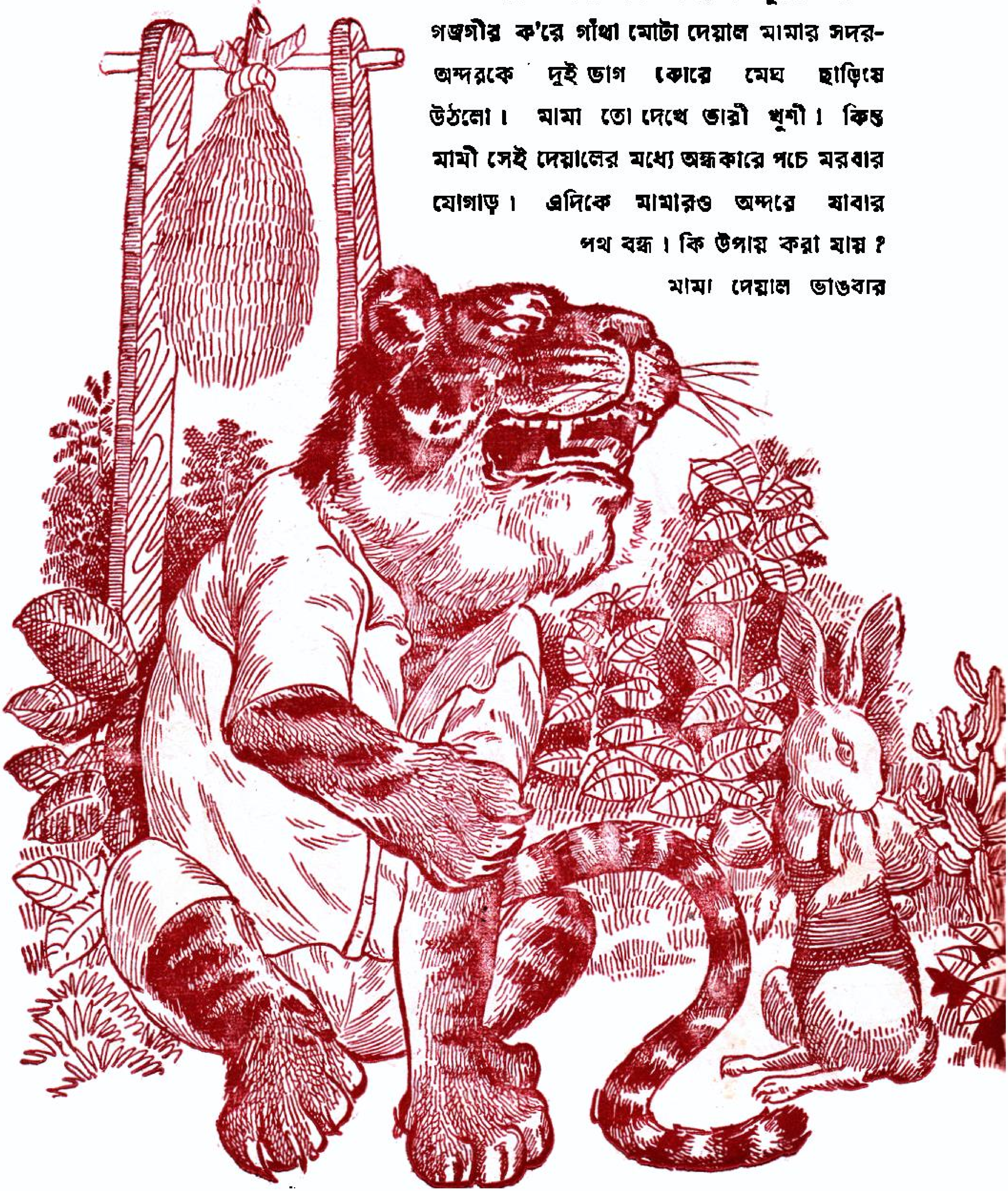
মামার বাড়ীর সদর আর অন্দর দুই মহলের মাঝে একটা দেয়াল দেবার হুকুম পেয়ে রাজমজুরের কাজ করতে এলো। তার নাম ছিল রতা বা রতন। শেয়াল



পণ্ডিত তখন খুবই ছোট, রতার বৌ তাকে কোলে নিয়ে চুন-সকির ঝুড়ি বইতে এসেছিল। তখন তাদের অতি দৈন্য দশা।

"রুতা মিস্ত্রি তো দেয়াল তুলে দিলে। গজগীর ক'রে গাঁথা মোটা দেয়াল মামার সদর-অন্দরকে দুই ভাগ কোরে মেঘ ছাড়িয়ে উঠলো। মামা তো দেখে ভারী খুশী। কিন্তু মামী সেই দেয়ালের মধ্যে অন্ধকারে পচে মরবার যোগাড়। এদিকে মামারও অন্দরে যাবার পথ বন্ধ। কি উপায় করা যায়?

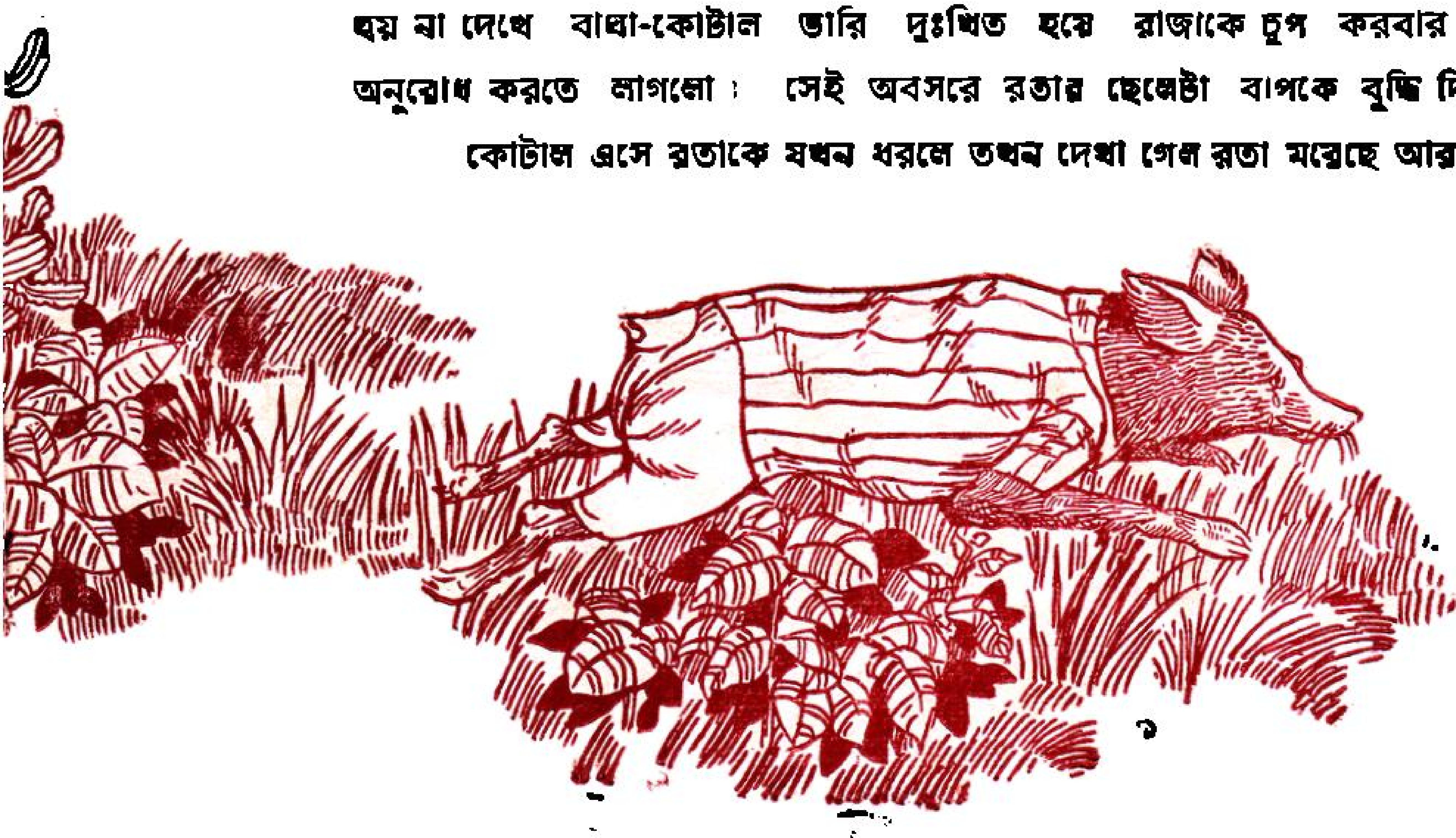
মামা দেয়াল ভাঙবার



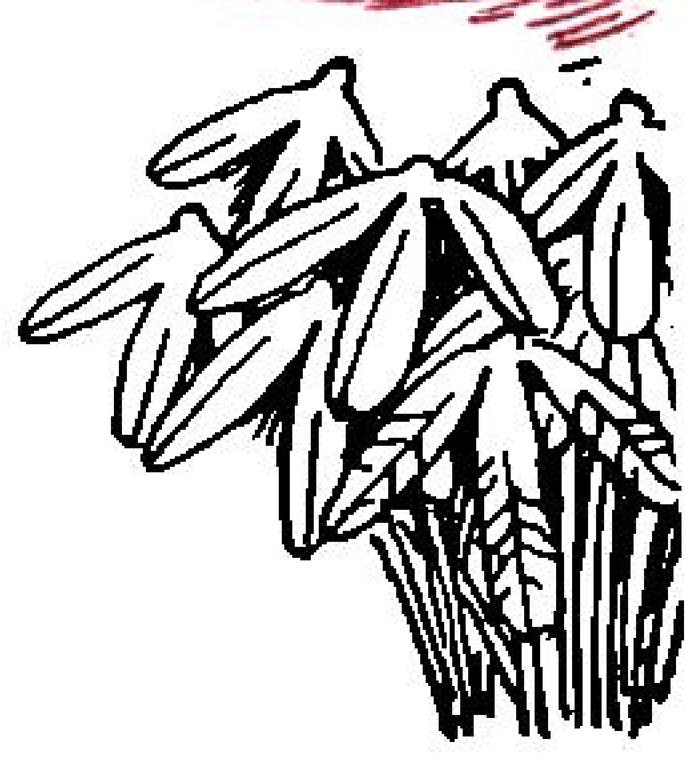
হুকুম দিলেন। কিন্তু পর্ব্বত প্রমাণ দেয়াল, তাকে ভেঙে ফেলা সহজ নয়। হাতী এলেন দেয়াল ভাঙতে, কিন্তু দেয়াল তেমনিই রইলো, লাভের মধ্যে হাতী দাঁত ভেঙে ফোগলা হয়ে ফিরে এলেন। ওদিকে ক্ষিদের জ্বালায় অন্দরের মধ্যে মামী এমন চীৎকার শুরু করলেন যে রাজ্যের লোকের কানে তালা ধরে গেল। ছোট-ছোট জানোয়ার তো ভয়েই মারা যাবার যোগাড়। রাজ্যে হুলুস্থূল।

"সবাই মামার দুর্ব্বুদ্ধির নিন্দে করতে লাগলো। পশুদের মধ্যে সদর-অন্দর বাড়ীর মধ্যে বাইরে—এ সব কোনো কালে ছিল না, হটাৎ নতুন-রকম কেতা করতে এ কি বিপদই মামা ঘটালেন। মামা রতা-শেয়ালকে ডেকে বললেন,—তিন দিনের মধ্যে-এর উপায় কর, না হলে তোমার প্রাণদণ্ড করবো। কিন্তু হায়, রতা-শেয়াল দেয়াল দিতে-দিতেই বুড়ো হয়ে গেছে! দেয়াল তুলতেই সে পাকা, দেয়াল-সরানো বিদ্যেতে সে একেবারেই মজবুত ছিল না। যে দেয়াল সে একবার তুলেছে, তাকে নামানো তার সাধ্য হলো না। মামী মামার দেয়ালের মধ্যেই মরে রইলেন।

"অন্দরের মধ্যে মামীর চীৎকার বন্ধ হলো কিন্তু বাইরে থেকে মামা ভোম্বলদাস এমন হাঁক-ডাক কান্না-কাটি তম্বি-তম্বা শুরু করলেন যে রতা-শেয়াল ভয়েই মরে যায় বুঝি! আর তাকে ধোরে ছাল ছাড়িয়ে মাথা গুঁড়িয়ে একটু একটু কোরে মারবার সুবিধে হয় না দেখে বাঘা-কোটাল ভারি দুঃখিত হয়ে রাজাকে চুপ করবার জন্য অনুরোধ করতে লাগলো। সেই অবসরে রতার ছেলেটা বাপকে বুদ্ধি দিলে। কোটাল এসে রতাকে যখন ধরলে তখন দেখা গেল রতা মরেছে আর তার









বৌ, আর এই আমাদের রতা শেয়ালের ব্যাটা শেয়াল পণ্ডিত মাথায় হাত দিয়ে কাঁদছে। রতাকে মেরে হাড়-গুঁড়িয়ে দেবার সুবিধে হলো না কিন্তু বাঘা-কোটাল রতার ল্যাজের চামরটা কেটে নিয়ে পতাকার মতো কোরে সেটাকে ফাঁসি-কাঠে লটকে দিয়ে তবে শান্ত হলো।

"ছেলের বুদ্ধি নিয়ে রতা ল্যাজটা মাত্র দিয়ে সে-যাত্রা প্রাণ নিয়ে—রাতা-রাতি কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সরে পড়লো বটে কিন্তু ল্যাজ তুলে সে দৌড় মারতে পারলে না—এর জন্যে শেয়ালের দলে সে ভারি লজ্জা পেল। সবাই বললে,—এর চেয়ে যে মরাও ভালো ছিল। রতা-বুড়ো কাঁদতে কাঁদতে তার ছেলেকে এসে বললে – তোরই জন্যে আমার এই লাঞ্ছনা। তখন শেয়াল পণ্ডিত গম্ভীর মুখে ভাবতে বসলেন—কি কোরে সব শেয়ালকে জব্দ করা যায়।

"ছেলেটার অগাধ বুদ্ধি। ভাবতেই তার মাথায় একটা ফন্দি এলো। সে চট্ কোরে তার বাপকে সাহেবদের নীল কুঠিতে নিয়ে এক পোঁচ নীল রং মাখিয়ে কানে ফুস-ফুস কোরে মন্তর দিয়ে ছেড়ে দিলে।

"রতা-শেয়াল ছিল লাল, এখন সে নীল হয়ে বনে ফিরে এসে মহা হৈ চৈ বাধিয়ে দিলে – রাজা-উজির মেরে বেড়াতে আরম্ভ করলে। শেয়াল বোলে তাকে আর চেনাই যায় না। মামা ভোম্বলদাস পর্য্যন্ত ভয়ে তাকে সিংহাসন ছেড়ে দিতে পথ পান না। কৈলাস-পর্বত থেকে পশুপতি ভোম্বলদাসের বোকামোর খবর পেয়ে এই নতুন রাজাকে রাজ্য শাসন করতে পাঠিয়েছেন —এই কথাই বনে-বনে রাষ্ট্র হয়ে গেল।

"মামা একে মামীর শোকে অস্থির, তার উপর সিংহাসন হারিয়ে পাগলের মতো হলেন। এদিকে রতা, যে একদিন মামার চাকর ছিল, মাইনের জন্যে দু-বেলা ভাল্লুক মন্ত্রীর কাছে ধন্না দিতো, মারের ভয়ে বাঘা-কোটালের বাড়ী এঁটো-কাঁটা ফেলে ত্রি-সন্ধ্যা খেটে মরতো, বকা-ধাম্মিকের জন্য মাছ কুটে-কুটে হাত খইয়ে ফেলতো সেই হলো হুকুম হাকামের কর্ত্তা। সবার যে কি দুঃখে দিন যাচ্ছে বলা যায় না, কিন্তু রাঙা রতা—সে রং বদ্‌লে বেশ সুখেই আছে। সবাই তার কাছে জোড়-হস্ত।

"সেই সময় রতা যদি আরো দিন-কতক নিজের বুদ্ধি না প্রকাশ কোরে তার পণ্ডিত ছেলেটার কথা-মতো চল্‌তো তবে কোনো গোলই হতো না। কিন্তু সিংহাসন পেয়ে রতার মাথা গরম হয়ে গেল। সেই সঙ্গে যেটুকু বুদ্ধি মগজে ছিল, সেটুকুও তার গায়ের রঙের মতো বদ্‌লে বাঁকা-চোরা উল্টো-পাল্টা হয়ে রতা যা-তা করতে আরম্ভ করলে।

"সব জানোয়ারের ল্যাজ থাকবে, কেবল তারই থাকবে না—এটা তার আর সইচে না। তার পণ্ডিত-ছেলের উপরই রাগটা বেশী। তারই কথাতেই তো সে ল্যাজ দিয়ে প্রাণ নিয়ে সরে ছিল। এখনো সেই ল্যাজ ফাঁসি-কাঠে ঝুলচে। সেটাকে নামিয়ে এনে নিজের পিঠে যে জোড়া দেবে তারও উপায় ছেলেটা রাখেনি।—নীল গায়ে লাল ল্যাজ মেলানো শক্ত। যত দোষ হলো শেয়াল পণ্ডিতের আর সেই অপরাধে সে রাজ্যের জানোয়ারদের ল্যাজ কেটে ফেলবার হুকুম দিয়ে বসলো।

জানোয়ারের দলে সোরগোল পড়ে গেল। সিংহ বেঁকে বসলেন—কিছুতেই ল্যাজ দেবে—না। দেখা-দেখি বাঘও গোঁ ধরলে—ল্যাজ আপ্‌সে বললে—যাক্ প্রাণ, থাক ল্যাজ। মোষও চোখ রাঙিয়ে বাঘের কথায় সায় দিলে। ভাল্লুকের ল্যাজ ছিল না বললেই হয়, সে বললে—রাজার হুকুম না মানলে নয়, মুশ্‌কিল! বানর তাকে দাবড়ি দিয়ে বলে উঠলো—তোমার চাকরি বজায় রাখতে ল্যাজ কাটতে চাও কাটো, কিন্তু আমরা তোমায় এক-ঘরে করব, মনে থাকে যেন। ভাল্লুক ভয়ে চুপ হয়ে গেল। ভাল্লুক যখন চুপ করলেন, তখন খরগোস, কচ্ছপ, হরিণ—যাদের ল্যাজ নজরেই পড়ে না তারা আর উচ্চবাচ্যই করতে পারলে না।

"এদিকে রাজার ইস্তাহার জারি হলো—পয়লা তারিখে শেয়ালদের, দোসরা তারিখে সিংহ-বাঘ এমনি সব হোম্‌রা-চোমরাদের, তেসরা তারিখে গোরু-গাধা-মোষ এদের, চৌঠা বাকি সব প্রজার ল্যাজ কাটা চাই, নচেৎ প্রাণদণ্ড!

"সব জানোয়ার ধর্ম্মঘট কোরে এমন রাজার বন ছেড়ে মানুষের রাজত্বে গিয়ে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় থাকবার মতলব করেছে, এমন সময় শেয়াল পণ্ডিত নাপিত-ধূর্ত্তর পাঠশালা থেকে নাকুর বদলে নরুণ, নরুণের বদলে হাঁড়ি, হাঁড়ির বদলে ধুচুনি আর ধুচুনির বদলে বাড়ীর গিন্নী কেমন কোরে আনতে হয়, সেই বুদ্ধি শিখে, বৌ-সঙ্গে ধুচুনি মাথায় ঢোল পিটতে-পিটতে বনে এসে হাজির। সব জানোয়ার তার বুদ্ধির তারিফ কোরে ল্যাজ বাঁচাবার একটা উপায় করতে তাকে ধরে পড়লো।

"পণ্ডিত শুনলেন প্রথমেই শেয়ালদের ল্যাজ নামাবার হুকুম হয়েছে। তিনি খানিক গম্ভীর হয়ে থেকে বললেন—তোমরা সবাই নিশ্চিন্ত থাক, এর উপায় আমি করব। পয়লা তারিখে সব শেয়াল আর জন্তু জানোয়ার যে যেখানে আছ, ঠিক সময় রাজসভায় হাজির হবে,—এদিক-ওদিক না হয়! রাজা যখন বলবেন—ল্যাজ কাটো! অমনি সবাই নিজের ল্যাজ দাঁতে চেপে ধোরে সিংহাসনের দিকে মুখ ফেরাবে, আর যা করতে হয়, আমি

করবো। কিন্তু কথা যেন ঠিক থাকে। আর পয়লা তারিখে ছেলে-বুড়ো সব শেয়ালের এক "রা" হওয়া চাই। না হলে সব মাটি।

"সবাইকে বুদ্ধি দিয়ে শেয়াল পণ্ডিত বৌ নিয়ে ঘরে যান, এ দিকে ভোম্বলদাস, বাঘ, ভাল্লুক এরা আনন্দ করছে; গাধা আর গোরু এরা ঘাড় নেড়ে বলাবলি করতে লাগলো—ভাই শেয়াল পণ্ডিতের যুক্তি তো ভালো বোধ হয় না। দাঁতে তো ল্যাজ কামড়ে ধরলেম, সেই সময় রাজা যদি এক হুঙ্কার ছাড়েন, তবে দাঁত কপাটি তো লেগে বসে আছে। তখন যদি ল্যাজের গোড়ায় দাঁত একটু চেপে বসে তবে ল্যাজ খসে না পড়ে যায়। আমাদের তো ভাই ভালো বোধ হচ্ছে না। শেষে ঠকতে না হয়। ভোম্বলদাস দুজনকে ধমকে দিয়ে বিদায় কোরে দিলেন। তারা দুই জনে দল ছাড়া হয়ে এক জন গেল গোয়াল-ঘরে বাঁধা পড়তে, এক জন গেল ধোবার বাড়ী মোট বইতে।

"পয়লা তারিখে বন বনে নীল রাজা কাটা ল্যাজে জরির ফুঁপি আর ময়ূরের পালকের এক রাখী বেঁধে গোম্‌সা মুখ করে ল্যাজ-ভাসান্ দেখবার জন্য ঘাড় উঁচু কোরে রাঙা মাটির সিংহাসনে উঠে বসলেন। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। নদীর জলে যেন রক্তের ঢেউ খেলচে। ধারে-ধারে শর বন-গুলোর মধ্যে জানোয়ারেরা গুঁড়ি মেরে বসে রাজার দিকে চেয়ে রয়েছে—কখন কি হুকুম হয়। এমন সময়ে শেয়াল পণ্ডিত রাজ্যের খ্যাঁকশেয়াল নিয়ে সভায় উপস্থিত হয়ে হাত জোড় কোরে দাঁড়ালেন। নীল রাজা এ পর্যান্ত কারো সঙ্গে কথা বলেন নি, পাছে মুখ খুললে শেয়ালের রা ধরা পড়ে যায়। ইশারায় শুধোলেন - কি হলো? পণ্ডিত নিজের ঝাঁটা ল্যাজ নিশেনের মতো আকাশে তুলে হেঁকে বললেন - হুয়া। অমনি চারিদিকে শেয়ালের পাল ডেকে উঠলো—হুয়া হুয়া! রাজা তাদের ল্যাজের দিকে আঙুল দেখিয়ে ইশারা করলেন—কি হুয়া?— - কিছুই হয় নি। কিন্তু শেয়াল পণ্ডিত কেবল বলতে লাগলো—হুয়া হুয়া হুয়া উচ্চা হুয়া উচ্চা হুয়া!

"এক শেয়াল ডাকলে সব শেয়ালকেই ডাকতে হবে—এটা বিধাতার নিয়ম। ডাকবার জন্যে রতার প্রাণ আইঢাই করতে লাগলো, তবু সে দু-হাতে মুখ চেপে বসে রইলো দেখে শেয়াল পণ্ডিত দল-বলকে ইশারা করলেন। ঠিক সেই সময় সূর্য্যও অস্ত গেলেন। অন্ধকারে শেয়ালের পাল চারদিক থেকে ডেকে উঠলো—হুয়া হুয়া হোতা হুয়া হোতা হুয়া! রতার মুখ আর বন্ধ থাকলো না। সে মোটা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো—ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া? না হুয়া না হুয়া!

"আরে শেয়াল!" - বোলে ভোম্বলদাস অমনি তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে এক থাপ্পড়ে রতাকে সিংহাসন থেকে ফেলে ফেললেন। সেখান থেকে বাঘ তাকে মুখে কোরে তুলে দেখালে—নীল রঙ ধুয়ে বেরিয়েছে—ল্যাজ কাটা রতা শেয়াল, রাজ-মিস্ত্রি।

"সেই অবধি শেয়াল পণ্ডিতকে মামা সভা-পণ্ডিত কোরে রাখলেন আর তারই বুদ্ধিতে চলতে লাগলেন। ছিল সে রাজমজুরের ছেলে, হলো সে রাজার প্রধান মন্ত্রী। অহঙ্কারে আর মাটিতে তার পা পড়ে না। তারপর বুদ্ধির জোরে সে কি না করলে? তার বাড়ী হলো, ঘর হলো—মামার দৌলতে তার সব হলো। এখন সেই মামাকেই সে নিজের গড়ে নিয়ে বন্ধ করবার যোগাড় করেছে—টিকটিকি এই খবর আমাকে দিয়ে গেল। কোন্ দিন সে মামাকে সারিয়ে-সুরিয়ে ফুস্‌লে-ফাস্‌লে নিয়ে আমারই বা সিংহাসন আবার কেড়ে নিতে আসে।"

# সিংহরাজের রাজ্যাভিষেক



সিংহরাজ বললেন,—"কোন্‌দিন বা শেয়াল-পণ্ডিত ভোম্বলদাস মামাকে নিয়ে আমারই সিংহাসন আবার কেড়ে নিতে না আসে।"

ভাল্লুক ঘাড় নেড়ে বললেন,—"হতে পারে।"

বাঘ ল্যাজ আপ্‌সে বললে—"এখনি এর একটা বিহিত করা চাই।"

গজপতি বললেন—"এমন কেউ নেই কি পাজি শেয়ালটা যাকে অপমান না করেছে।"

মোষ চোখ রাঙিয়ে বললেন—"ওটা বিষম ঠক।"

ছোট ছোট জানোয়ার, তারা বলে উঠলো—"দোহাই মহারাজ, ওর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ওর জ্বালায় ঘর করা দায় হয়েছে।"

সিংহ সবাইকে অভয় দিয়ে বললেন,—"ভয় নেই। ওকে আমি রীতিমতো শাস্তি দেব। আসছে মাসে মামীর শ্রাদ্ধ, সেই দিনই এখানে আনাচ্ছি; তারপর বিচার কোরে দেখা যাবে কি করা যায়। এখন তোমাদের ওর নামে যদি কিছু নালিশ থাকে প্রকাশ কোরে বলতে পার, সজারু সব লিখে নেবেন। আমি তো শেয়াল পণ্ডিতের মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেশছাড়া করব কিন্তু তোমাদেরও আমার জন্যে কিছু তো করা চাই। মামা তো কৈলাসে গেলেই শীতে মরবেন জানা কথা, কেবল শেয়াল পণ্ডিতই তাঁকে বুদ্ধি দিয়ে কৈলাস যেতে দিচ্ছে না। এখন মামা শুনছি তপস্যা কোরে নতুন শরীর পেয়েছেন। শেয়াল তাঁকে রোজ একটা কোরে পাঁঠার রক্ত খাইয়ে বেশ মোটা-সোটা করে আবার যে দিন রাজ্যে ফিরিয়ে আনবে, সে দিন আমাকে তো সিংহাসন ছেড়ে নামতেই হবে, তোমাদেরও যে কারু ল্যাজ সে রাখবে তা বোধ হয় না। তাঁর নামে তোমরা যে সব নালিশ রুজু করতে চলেছ, এ খবর তাঁর কাছে পৌঁছবে। অতএব তোমাদের উচিত যে আজই আমাকে মামার

রাজ্যে অভিষেক করা। আমার রাজ্য হলে আমি যা বিচার করব, তার উপর আর মামা এলেও কথা চলবে না - মামার বাবা এলেও নয়।"

এই বোলে সিংহ হুঙ্কার ছেড়ে চারিদিক চাইলেন। সব জানোয়ার ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে এক সঙ্গে ল্যাজ তুলে জানালে - "তাই হোক। এখনি আপনাকে অভিষেক করা হোক। বুড়ো ভোম্বলদাসকে চাইনে আমরা -সে তার পণ্ডিতের বুদ্ধিতে চলতে চায় চলুক, আমরা গায়ের জোরে সিংহকে রাজা করবো—জোর যার মুলুক তার।"

সিংহরাজ মামার মালখানা খুলে রাজমুকুট, রাজদণ্ড, শ্বেতছত্র, শ্বেতচামর আনতে মন্ত্রীকে হুকুম করলেন। ছুঁচোর কাছে মালখানার চাবি থাকতো, সে এসে নিবেদন করলে, পণ্ডিত মশাই যাবার একহপ্তা আগে বুড়ো রাজার হুকুম-নামা দেখিয়ে মালখানার চাবি তার হাত থেকে নিয়েছেন : সে চাবি তার কাছে এপর্য্যন্ত ফিরে আসে নি। সিংহ এক থাপ্পড়ে ছুঁচোকে যমালয়ে পাঠান আর কি, এমন সময় ভাল্লুক-মন্ত্রী সিংহকে রাজা না হতেই অবিচার কোরে ছুঁচো-মেরে হাত-গন্ধ করে বসতে নিষেধ করলেন।

কিন্তু মালখানার দরজা না খুললে তো কাজ-কর্ম্ম চলে না।

সিংহ হুকুম দিলেন—"ভাঙো দরজা।"

দরজা গেঁথেছিল রতা শিয়াল, হাতী হয়েছিল ফোগ্‌লা—তিনি সে কাজে আর এগুলেন না। মোষ গেল, ষাঁড় গেল—সবাই শিং বেঁকিয়ে ফিরে এলো। বুনো শুয়োর তার ছিল সোজা ছুঁচোলো দাঁত, দরজায় ধাক্কা খেয়ে অর্দ্ধচন্দ্রের মতো বেঁকে গেল। গণ্ডারেরও ঐ দশা। এদের মধ্যে কেউ দাঁতে কোরে, কেউ শিঙে কোরে না তুলেছেন, না ভেঙেছেন এমন নেই, কিন্তু কি গাঁথুনিই গেঁথেছিল রতা—দরজা খুললো না।"

এদিকে এই খবর যেখানে ভোম্বলদাস শেয়াল পণ্ডিতের সঙ্গে বসে শাস্ত্র-আলোচনা করছেন সেখানে এসে কেউ জানিয়ে গেল। মামা তো হেসেই অস্থির; শেয়ালকে বললেন— ওহে পণ্ডিত, চাবিটা ভাগ্নেকে পাঠিয়ে দাও—আরো কিছু মজা হোক।"

শেয়াল বল্লেন,—"চাবিটা মহারাজ আমি গিয়ে দিয়ে আসি। নতুন রাজা খুশী হবেন—কি বলেন।"

ভোম্বলদাস চোখ-মটকে বল্লেন—"যাও, কিন্তু ভাগ্নে যখন উত্তম, মধ্যম পুরস্কার হুকুম দেবেন, সে সময় ল্যাজ-তুলে তাঁকে আশীর্ব্বাদ কোরে চট্‌পট্ ফিরে আসতে ভুলো না।"

শেয়াল যদি গেল বিদায় পেয়ে তো মশা এলো ভোম্বলদাসের কানের কাছে ভন্ ভন্ করতে। মশা মিহি সুরে কানের কাছে বললে,—"মহারাজ!"



ছুঁচোর মতো কথা বিঁধলো—ভোম্বলদাসের প্রাণে। তিনি মাথা নেড়ে নিশ্বাস ফেলে বল্লেন—"আর মহারাজ বোলে কেন সম্বোধন কর? আমার যথাসর্ব্বস্ব গেছে পরের হাতে।"



মশা আর একবার এগিয়ে এসে বললে—"ধন-দৌলত সকলই মজুদ। হুকুম করেন নির্ভয়ে বলতে তো বলি। ঐ যে দেখেন উই ঢিবি—"

ভোম্বলদাস ল্যাজ-আপসে উঠে বললেন,—"উই ঢিবি কি বল? ওটা না কৈলাস-পর্ব্বত!"

ভোম্বলদাসের হুমকি শুনে মশা তো ভয়ে কম্পমান। তার মিহি সুর আরো মিহি হয়ে গেল। সে কেবলই পিঁ পিঁ কোরে কি বলতে লাগলো কিছুই বোঝা গেল না। ভোম্বল-দাস তখন মশাকে অভয় দিয়ে বললেন—"বোলে চল।"

মশার তখন কথা ফুটলো। সে যা বললো ভোম্বলদাসকে খুব ছোট-ছোট করে তা শোনা মাত্রই যেন হাজার ছুঁচ ফুটলো রাজার গায়ে। তিনি একেবারে দন্ত কড়মড় কোরে চার থাবা দিয়ে নিজের গা আঁচড়াতে থাকলেন

রাগে এমন যে নিজের ছাল-চামড়া কিছু আর রইলো না গায়ে। খেয়ে দেয়ে যেটুকু বা রক্ত হয়েছিল গায়ে তার সবটা বেরিয়ে গেল একদম। খালি রইলো হাড়-কখানার মধ্যে ধুক্‌পুক করতে তার প্রাণটুকু।

রাজ রক্ত মাটিতে পড়ে মাটি হয় দেখে মশার দল এসে জটলো চারিদিক থেকে। ভোম্বলদাসকে তারা ঘিরে রইল দিনরাত খুব সাবধানে। তাঁরা গায়ে ফুঁড়ে ফুঁড়ে সব কড়া ওষুধ দিতে থাকলো। কেউ তার রক্ত পরীক্ষা কোরে দেখে—ম্যালেরিয়া হলো কি না। কেউ দেখে টাইফয়েড হলো কি কালাজ্বর?

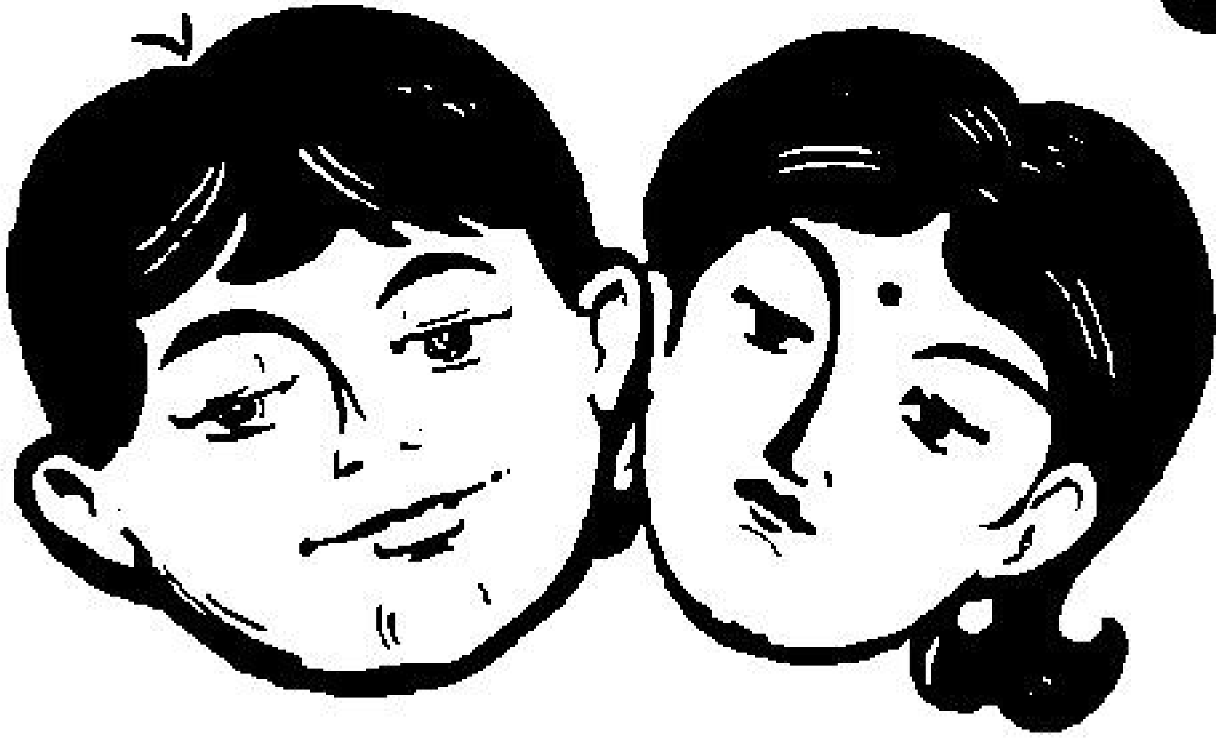
এমনি রক্ত শুষতে-শুষতে যখন ভোম্বলদাসের লাল চামড়া প্রায় সাদা হয়ে এসেছে সেই সময় শেয়াল পণ্ডিত ধুচুনি মাথায় ডুগ্‌ডুগি বাজাতে বাজাতে হাজির। একেবারে রাঙা চেলি-পরা বরের সাজ কিন্তু নাকটি কাটা। ভোম্বলদাস শেয়ালের সেই চেহারা দেখামাত্রই এমন অট্টহাসি হাসলেন যে তাতেই তার প্রাণ-বেরিয়ে গেল? ভাগ্নের খবর, সুন্দর-বনের কথা শুধোবার কিন্তু ভাঁড়ার ঘরের চাবি ফিরে চাইবার আর সময়ই হলো না।

শেয়াল পণ্ডিত খানিক হতভম্ব হয়ে চেয়ে থেকে একটা নটে গাছের গোড়ায় রাজ-ভাণ্ডারের চাবিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজেরগর্তে ঢুকতে গেল, আর একটা ছাগল---ঠিক তেমনি ছাগল, যাদের পাঁটার জুস্ খেয়ে ভোম্বল দাস নিজের গায়ের রক্ত করেছিল—সে কোথা থেকে এসে বনের ধারে—নটে গাছটার গোড়াসুদ্দ মুড়িয়ে খেয়ে দিব্যি আরামে কৈলাস-পর্ব্বতের মতো প্রকাণ্ড উই ঢিবির চুড়োয় তিন লাফে গিয়ে উঠলো—

ঠিক দুক্কুর বেলা,
যখন ভূতে মারে ঢেলা।

সেখান থেকে সে শুনলে সুন্দর-বনে নতুন রাজার অভিষেকের দিনে জোড়া পাঁটা নজরানা দেবার আগে তাকে ডাকাডাকি করছে ম্যা ম্যা বোলে।

# খোকা-খুকি



আদরপুরের রাজার ঘরে মানুষ হয় খোকা; আর খুকি—সে মানুষ হয় অনাদরপুরে কাঙা-লের ঘরে। সে কাদের খোকা, কাদেরই বা খুকি তা তো জানতে পারছি নে, শুধু দেখতে পাচ্ছি—খোকা আছেন রাজার হালে, সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে দুধিভাতি খেয়ে; আর খুকি—সে রয়েছে উপবাসে ছেঁড়া কাঁথায় ভিজে মাটির উপর।

ঠাকুর পাঠিয়েছিলেন খোকাখুকি দুজনকেই এই পৃথিবীতে দুটি রূপের ফুল হয়ে ফুটে উঠতে আপনা আপনি; কিন্তু রাজাটা ভাবলে—আদর না পেলে, যত্ন না পেলে ছেলের বাঁচা মুশকিল ফুলকে নিয়ে সে সোনার কৌটোতে ভরে রাখলে। আর কাঙাল—সে গোড়া থেকেই ভেবে নিলে ফুল তো শুখোবেই, কাজেই মেয়ের মরা-বাঁচার ভাবনা-ই সে ছেড়ে বসলো একেবারে গোড়া থেকে।

গামলার গাছে গোলাপফুল যেমন বাড়ে তেমনি বাড়তে থাকলো রাজপুতুর আর পাঁকে পড়ে পদ্ম যেমন বাড়ে, তেমনি বাড়তে থাকলো দিনে দিনে কাঙালিনী কন্যা। একেও দেখে লোকে বলে আহা, ওকেও দেখে লোকে করে আহা। কিন্তু রাজার ছেলে যখন আবদার করে তখন তার মন যোগাতে লোকে পথ পায় না—গাঁঠের কড়ি খরচ করে অকাতরে, যার গাঁঠ কাটা গেছে সে-ও ধার করে রাজপুতুরকে খুশী করতে চলে। আর কাঙালিনী সে মুণ্টি ভিক্ষে চেয়ে দুয়োরে দুয়োরে ঘোরে—কোন দিন পায় দুমুঠো ক্ষুদ, কোন দিন পায়ও না। যে দিন বা পায়, সে দিন চোখের জলে নুন দিয়ে সে ভিক্ষের চাল একটু একটু করে ভিজিয়ে খায়।

মড়ক আসে,—সে আদরপুরেও আসে, অনাদরপুরেও আসে। আঁচিল পাঁচিল ঘেরা সাতমহলের মাঝ থেকে এক রাতে রাজপুত্রের সাত বোনকে নিয়ে চলে যায় সব

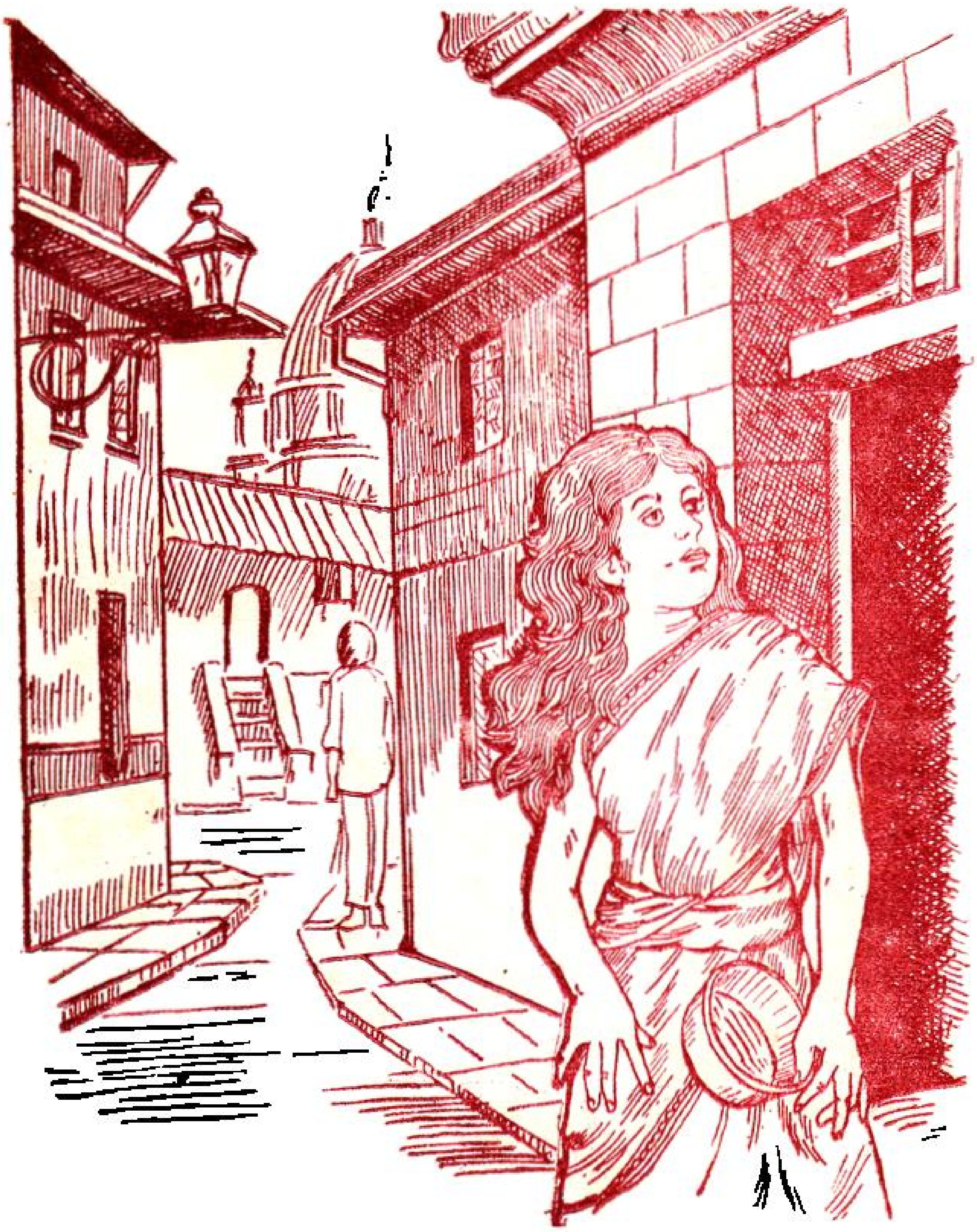
বাধা ঠেলে। কাঙালের ঘরে তার আসার কোন বাধা নেই, তবু সে আসে, কিন্তু খুঁজে পায় না কাকে নেবে। কাঙালিনী কন্যাকে কাঁদিয়ে তার পোষা এতটুকু পাখিটাকে মেরে চলে যায়।

পাখির প্রাণ আর সোনার খাঁচায় ধরা রাজকন্যাদের প্রাণ বাতাস ধরে ভাসতে



ভাসতে চলে যায়—বিষ্টির মেঘের আড়াল দিয়ে, আপন জনকে ডাকতে ডাকতে, চোখ-ভেজানো বুক-ফাটানো সুরে।

রাজপুত্র হন রাজকন্যাদের জন্যে থেকে থেকে আন্‌মনা, অমনি তাঁকে ভোলাতে আসে নতুন নতুন খেলনা, নীলার ময়ূর, সোনার টিয়ে, শিকল বাঁধা বাঘের ছা, হাঁস, ঘোড়া, কত কি। দুধ আসে, ক্ষীর আস, মতিচূর আসে, মিহিদানা আসে,—রাজপুত্র ভুলে যায়, আবার ভোলেও না। আর কাঙালের মেয়ে, তার আন্‌মনা হবার সময় নেই—সে নিয়মিত ভিক্ষে করে বেড়ায়, আর কাঁদে পাখির জন্যে। লোকে বলে—মেয়েটা মায়া-কান্না কাঁদছে, বেশী করে ভিখ্‌ পাবে বলে



ঠাকুর থাকেন বসে চল-সমুদ্রের কিনারায়, পায়ের তলায় তাঁর অপার জল টলটল করে জীবন নদী সমস্ত দিন-রাত গড়িয়ে চলে ঠাকুরের পা ধুয়ে অকূল সাগরে মিলতে। ঠাকুরের হাতে একখানি পদ্মপাত, তারি মাঝে টল টল করে জগৎসংসার—একটি ফোঁটা জলবিন্দু। সেই পদ্মপাতায় ধরা জলবিন্দুর পাশে আর একটি ছোট ফোঁটা এসে লাগল, যেন কার চোখের জলে গড়া একটি মুক্তো। ঠাকুরের দৃষ্টি—যেমন করে শিশিরের উপর পড়ে সকালের আলো—তেমনি পড়লো এতটুকু জলের ফোঁটায়।

ওদিকে আদরপুরে সকাল থেকে রাজপুত্রের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। রাজবেশ পড়ে

আছে ধুলোয় —সোনার পালঙ্ক শূন্য। লোক ছুটলো চারিদিকে, সৈন্য ছুটলো, সামন্ত ছুটলো খুঁজলো সবাই রাজ্যে-রাজ্যে—পেলে না। যদি শিকারে গিয়ে থাকেন—বনে-বনে খুঁজলে, কোথাও নেই। বিদেশে যদি গিয়ে থাকেন - দেশ বিদেশ খুঁজলে, সন্ধান হয় না রাজপুত্রের। আদরে-মানুষ রাজার ছেলে, অনাদরপুরে সে যে যেতে পারে এ কথা কারো মনেই এলো না।

অনাদরপুরে গোধূলির বেলা নবীন ভিখারী একতারা বাজিয়ে চলেছে—ঘরে ঘরে ঘরে দুয়োর ভেজানো দেখে। চলতে-চলতে এসে দাঁড়ায় ভিখারী কাঙালিনীর পাশে—গান গায় ভিখারী, ভিক্ষা দেয় কাঙালিনী—চোখের জলে ভেজা একটুখানি আদর।

ঠাকুরের হাতে পদ্মপাতায় পাশাপাশি দুটি জলের ফোঁটা এক হয়ে মেলে—শুক তারা আর যেন সন্ধ্যা-তারা।

# হিন্দবাদের প্রথম সিন্দবাদের শেষযাত্রা



সিন্দবাদ ছিল এক রকমের মানুষ আর হিন্দবাদ ছিল ঠিক তার উল্টো ধরনের লোক। সিন্দবাদ বারে বারে সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে—রত্নগিরি, সলাবত দ্বীপ, বালাশোর বন্দর, কাফ্রিস্তান, -নারকেল নগর, চন্দন-দ্বীপ, কুমারিকা অন্তরীপ, সরন্দিপ এমনি কত দেশ বিদেশে বাণিজ্যপোত ভেড়াতে ভেড়াতে, কোথাও আর বাকি নেই। আর হিন্দবাদ থাকে বোগদাদে বসে আর গল্প শোনে সিন্দবাদের কাছে; রুক পাখির গল্প, মহীরাজের ঘোড়ার কথা, লোমশ মানুষের ইতিহাস, অজগর সাপের কাহিনী, বিষ-লতার, গোলমরিচের ক্ষেতের, আরবি পাশার, জিন-লাগাম-শূন্য ঘোড়-সওয়ারের, কবরী কন্যার, ভীষণ-বুড়োর, মুক্তোর ক্ষেতের, বোম্বেটে-জাহাজের, হাতী শিকারের নানা অদ্ভুত অদ্ভুত খোস গল্প—উল্টে পাল্টে কতবার তার ঠিক নেই, আর এক এক গল্প শোনার পরে একশো করে নেসার মোহর সিন্দবাদের কাছে দাবী করে।

সিন্দবাদ এক একবার বাণিজ্য যাত্রা করতো, আর হিন্দবাদ গালে হাত দিয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে ভাবত—যদি সিন্দবাদের জাহাজ হটাৎ কোনো দ্বীপে চিরকালের মত আটকে যায়, কিম্বা সিন্দবাদ ফিরেই না আসে, কোন দেশের কোন রাজকন্যাকে বিয়ে করে সেই দেশেই সংসার পেতে বসে, তা হলে উপায় কি হবে? কিন্তু সিন্দবাদের জাহাজ ডোবে, চড়ায় আটকায়, সিন্দবাদও ধরা পড়ে যায় কখনো কখনো কিছুদিনের জন্যে, আবার কিন্তু ফিরে আসে সিন্দবাদ—নতুন বাণিজ্যপোতে জাহাজ বোঝাই গল্প আর মাল-মত্তা মাঝি-মাল্লা নিয়ে।

সিন্দবাদ প্রতিবারেই ফিরে আসে আর বলে এই শেষ, আর যাবো না। কিন্তু প্রতিবারেই সমুদ্রের নীল জল আকাশের মতো ঘন নীল হয়ে ওঠে বছরের শেষে, আর সিন্দবাদ

জাহাজ সাজিয়ে হিন্দবাদের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাণিজ্যে আর গল্প সংগ্রহে।



ক্রমে সিন্দবাদের ফিরে আসা আর যাওয়ার শেষ নেই – এই বিশ্বাসই হিন্দবাদের মনে খুব

শক্ত হয়ে বসে গেল। সেই সময় একদিন হঠাৎ সিন্দবাদ চুপি চুপি কাউকে কিছু না জানিয়ে



একটা ভাঙা জাহাজে একেবারে গল্পের দেশের শেষ দেখতে বেরিয়ে পড়েছে, হিন্দবাদ এর

কিছুই জানে না ; সে বছরের শেষে গল্প শুনতে সিন্দবাদের দরজায় এসে মোটের ঝুড়িটা নামিয়ে বসলো।

তখনো রাত ফরসা হয়নি, বোগদাদের রাস্তার পাথরগুলো হিমে ঠাণ্ডা হয়ে আছে, দোকান পাট সমস্ত বন্ধ, সরু গলির শেষটাতে নীল সমুদ্রের মতো একটা অন্ধকার, আর কিছু নেই—সাড়া নেই, শব্দ নেই, আলো নেই। হিন্দবাদ সিন্দবাদের দরজায় হিম পাথরের চাতালে ঝুড়ির উপরে মাথা রেখে শুয়ে সকালের অপেক্ষায় রয়েছে—কিন্তু সকাল আর আসছে না, সিন্দবাদও দেখা দিচ্ছে না, রাতের বাতাস কেমন যেন ঠাণ্ডা বইছে।

হিন্দবাদ ছেঁড়া কাঁথাটায় সর্ব্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে গলির মোড়ের দিকে চেয়ে সেই এক টুকরো নীলের গায়ে একটা জাহাজের মাস্তুল কখন দেখা দেয় তারি অপেক্ষায় চেয়ে আছে। দূরে একটা যেন জাহাজের আসার ছপ্ ছপ্ শব্দ পাচ্ছে হিন্দবাদ মনের মধ্যে। কবরী কন্যা কেবলি আজ যাতায়াত করছে। প্রকাণ্ড একটা কবর—তার ধারে এক চমৎকার সুন্দর—কালো চুলে তার ফুলের মালা, ঠোঁটে হাসি লেগে রয়েছে, হাতের আঙুল হেনার রঙে হিঙ্গুল বর্ণ। সেই সুন্দরী কন্যে হাতছানি দিয়ে হিন্দবাদকে ডাকতেই সে তার সঙ্গে চলে গেল গলি পেরিয়ে, বোগদাদ ছাড়িয়ে কতদূর কে জানে ?

হটাৎ কন্যা বলে উটল—এই ঘুমের দেশ, ঐ যে সিন্দবাদ।

হিন্দবাদ চেয়ে দেখবার চেষ্টা করলে কিন্তু ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে গেছে, আর খুললো না।—সেলাম আলেকম্ বলে হিন্দবাদ একবার হাতটা কপাল ছোঁয়াতে চেষ্টা করলে, হাত উঠলো না।